

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমোনমঃ

বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।



৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৩২

জীবাণুর কথা।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যাহারা যায়, তাহারা সেখানে বড় বড় হাতী হইতে আরম্ভ করিয়া এতটুকু ছোট পিঁপড়া পর্য্যন্ত কত রকম বেরকমের জানোয়ারই সেখানে দেখিতে পায়, আর অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। প্রথমবার যে সেখানে যায় সে হয়ত ভাবে এত জানোয়ারও ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন! অবাক্ কাণ্ড! ইহারা সব ছিলই বা কোথায়, আর খাইতই বা কি! ভগবানের সৃষ্টি যে কি বিপুল ও কি বিচিত্র তা পৃথিবী না ঘুরিয়া আসিয়াও বুঝিতে বাকি থাকে না।

কিন্তু চিড়িয়াখানা দেখিয়া যাহারা অবাক হইয়া যায়, তাহাদের যদি বলি যে, ওর চেয়ে আরও বিচিত্র চিড়িয়াখানা তোমারই আশে পাশে রহিয়াছে, অথচ তুমি হয়ত তার কোনও সন্ধান জান না, তাহা হইলে তোমরা কি কর? আমার কথা অবিশ্বাস করিবে, না—একেবারে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবে?

কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই ইহাতে। তোমার আমার, সকলের আশে পাশে—এই হাওয়ার মধ্যে, মাটীর মধ্যে, জলের মধ্যে, এত বিচিত্র জীব আছে, যাহাদের সন্ধানও হয়ত তোমরা জান না;—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আলিপুরের চিড়িয়াখানার লেবেল আঁটা জানোয়ারদের সংখ্যার চেয়ে একটুও কম নয়, বরং ঢের ঢের বেশী।

শুধু চোখে ইহাদের দেখা যায় না। ভগবানের কাছে অদৃশ্য হইবার কোনও বর অবশ্য ইহারা পায় নাই, কিন্তু ইহারা এত ছোট যে মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তি ইহাদের দেখিবার চেষ্টা করিয়া হার মানিয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি মানুষের সীমাবদ্ধ হইলেও, বুদ্ধিটা বোধ করি ভগবান মানুষকে অসীম করিয়াই দিয়াছেন। তাই নিজের ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা মানুষ তাহার বুদ্ধির সাহায্যে অনেকটা পূর্ণ

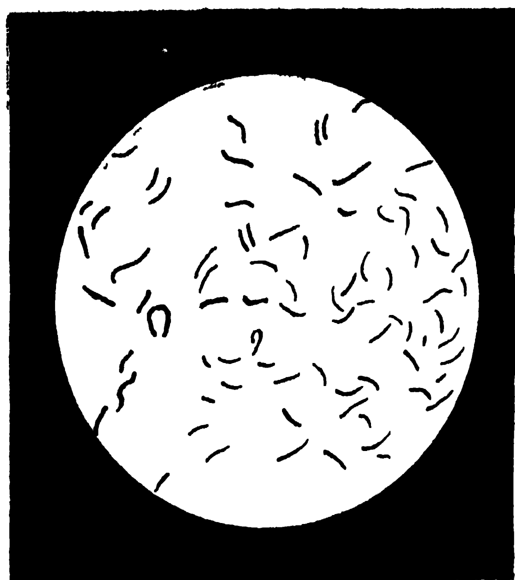
করিয়া নেয়। এ বিষয়েও তাহার বড় একটা ত্রুটি হয় নাই। অনুবীক্ষণ বা মাইক্রোস্কোপ নামে একপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, মানুষ তাহার আশপাশের এই বিচিত্র চিড়িয়াখানার অতি ক্ষুদ্র জীবগুলিকে দেখিয়াছে।- আর শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে তাহাদের অনেককে আবার চিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহারা মানুষের শত্রু, কাহারা যে মানুষের বন্ধু, কাহারা কি খায়, কিসে থাকিতে ভালবাসে, কখন ঘুমায়, কখন ঝগড়া করে, কি করিয়া বাড়িয়া যায়, কি ভাবে দিন কাটায়, কিসে মরে, ইহার অনেক খবরই মানুষ তাহার উদ্ভাবিত এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রটীর সাহায্যে স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিয়া ফেলিয়াছে। এ জানার তাহার এখনও শেষ হয় নাই,--নিত্যই নূতন খবর মানুষের গোচর হইতেছে;—আরও কত অদ্ভুত খবর যে মানুষ জানিতে পারিবে, তার ঠিক ঠিকানা নাই।

কিন্তু এইভাবে যতটুকু সংবাদ মানুষ জানিতে পরিয়াছে তাহাতেই সে অবাক হইয়া গিয়াছে। বৈচিত্র্য আলিপুরের চিড়িয়াখানার মধ্যে লুকাইয়া নাই,—আসল বৈচিত্র্য মানুষের আশে পাশে সব সময়েই তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এ খবর মানুষ আজ যেমন জানিতে পারিয়াছে এমন আর কোনও দিন পারে নাই।—শুধু দেখিতে জানা চাই।

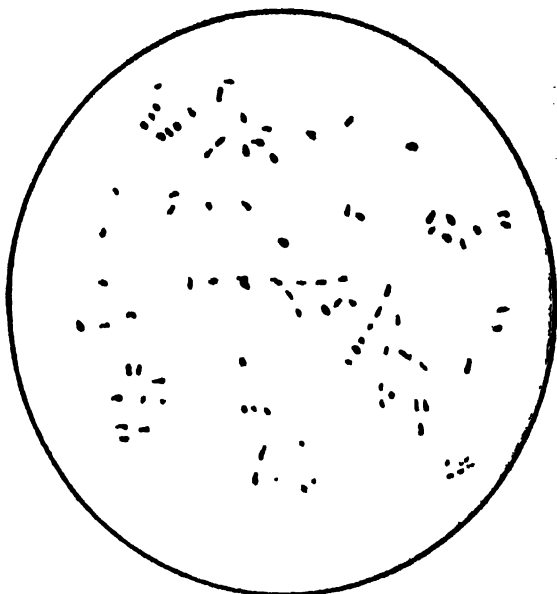
মাত্র কয়েক বছর আগেও লোকে এই অতি ক্ষুদ্র জীবগুলির সম্বন্ধে কিছুই জানিত না—কিন্তু মজা দেখ, এখন মানুষ কেমন মুরুব্বিয়ানা চালে এই সব জীবাণুদের পরিচয় দেয়—যেন ইহারা সব কত কালের চেনা।

এই জীবাণুদের কার্য্যকলাপ ও জীবন বৃত্তান্ত জানিবার আগ্রহ কি তোমাদের হয় না? নিজের চোখে দেখিতে যাহারা চাও, তাহাদের আগে একটা মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র যোগাড় করিতে হইবে;—কিন্তু তাহা যাহারা না পারিবে, তাহাদের অন্ততঃ ইহাদের সম্বন্ধে গোটাকতক মোটা কথা এখানে শুনাইয়া দিতে পারি। কি বল?

জীবাণুরা ছোট হইলেও জীব;--সুতরাং জীবন্ত। প্রাণ যখন আছে, তখন মানুষ প্রভৃতি অন্যান্য জীবদেরই মত ইহারা জন্মায়, খায় দায়, ঘুমায়, খেলা করে, বাড়ে, বংশবৃদ্ধি করে, আত্মরক্ষা করে ও মরে। কিন্তু মজা এই যে, জীবন নির্ব্বাহের কাজ কর্ম্ম সবই এরা করে বটে কিন্তু মানুষ বা অন্য জন্তুদের মত হাত, পা, চোখ, কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি ইহাদের কিছুই নাই;— অন্ততঃ মানুষ অনেক চেষ্টা করিয়াও আজও পর্য্যন্ত জীবাণুদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কিছু আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে নাই। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণুদের কিরূপ দেখায় পরের পৃষ্ঠার ছবিগুলি দেখিলে তাহার কতকটা আন্দাজ তোমরা পাইবে। মনে রাখিও যে এই সব জীবাণু এত ছোট যে শুধু চোখে ইহাদের দেখা একেবারেই অসম্ভব; অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের আকার অনেকগুণ বড় দেখায় বলিয়া ইহাদের এই আকৃতি দেখা সম্ভব হইতেছে। দেখ এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই জীবাণুগুলিকে নানা রকমের দেখাইতেছে। কোন জীবাণু বা একটী বিন্দুর (.) ন্যায়; কোনটী বা একটী ছোট দাঁড়ির (।) ন্যায়; কোনটী বা ছোট একটী কমার (,) ন্যায়; কোনটী বা ঢেউ খেলান- সবই রকমারি। আরও যে



কলেরার জীবাণু ১৫০০ গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে



প্লেগের জীবাণু ৮৫০ গুণ বর্দ্ধিতাকারে দেখান হইয়াছে।



যক্ষ্মা রোগের বীজাণু হাজার গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে

কত রকমের আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইতো উহাদের আকার!—কোথায়ই বা মুখ, কোথায়ই বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আর কোথায়ই বা ইন্দ্রিয়াদি। তবু ওই অতটুকু প্রাণীই খাওয়া বসা শোওয়া;

প্রভৃতি জীবননির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্যই অবহেলে নির্ব্বাহ করিতেছে ;—শুধু নির্ব্বাহ করিতেছে নয়—তোমার আমার অনেকের চেয়েই হয়ত ভালভাবেই নির্ব্বাহ করিতেছে। আত্মরক্ষা করিতে এই সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী একেবারে অদ্বিতীয় বলিলেই হয়। আর আহার সংস্থানের জন্য ইহারা হাতী, মানুষ প্রভৃতি বড় বড় প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত ছোট বড় যে কোনও প্রাণীকে বীরদর্পে আক্রমণ করিয়া তাহার সংগৃহীত খাদ্যে ভাগ বসাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তুমি হয়ত টেরই পাইলে না—তোমার অজ্ঞাতসারেই ইহারা তোমায় আক্রমণ করিয়া কাহিল করিয়া ফেলিল—এরূপ ঘটনা প্রাণীজগতে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। ইহাদেরই খাদ্য জোগাইতে গিয়া মানুষ অধিকাংশ সময় দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল জানিতে পারিয়াছেন যে মানবের অধিকাংশ ব্যাধিই এই জীবাণুদের দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আহারের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে জীবাণুরা মানবদেহের সংস্পর্শে আসে—সেখানে জীবন্ত মানবদেহে প্রচুর খাদ্যের সন্ধান পাইয়া সেইখানেই আড্ডা গাড়ে এবং অধিকাংশ সময়েই মানবদেহের অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি ও বংশবৃদ্ধি করে।

মানবদেহের ব্যাধির সহিত জীবাণুদের প্রকৃত সম্বন্ধ মানুষ অতি অল্প দিনই জানিতে পারিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেমনই কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য জানা উচিত। মানুষের দেহের সুস্থতা এবং জীবন মরণ অনেকটা ইহার উপর নির্ভর করে, তাই এ সম্বন্ধে আজ তোমাদের কিছু বলিব।

সব জীবাণুই যে মানুষের অপকার করে—তা নয়। এমন অনেক রকমের জীবাণু আছে যারা সত্যই মানুষের যথেষ্ট উপকার করে। দই জিনিষটা খাইতেও যেমন উপাদেয়, তেমনি মানুষের পক্ষে উপকারী—এ কথা তোমরা অনেকেই জান। এই দুইয়ের মধ্যে এক প্রকার জীবাণু আছে, যাকে বলে ল্যাক্‌টিক এসিড ব্যাসিলি। এই জীবাণুগুলি থাকার দরুণই দই মানুষের পক্ষে উপকারী ;—এবং এগুলি না থাকিলে দইয়ের উপকারিতা ঢের কমিয়া যায়।

কিন্তু অধিকাংশ জীবাণুই মানুষের উপকারের বদলে ক্ষতিই করে বেশী। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি ভীষণ ভীষণ রোগের মূল কারণই হইতেছে জীবাণু। আমাদের ভারতবর্ষে এই রোগ কয়টার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটু ভাল করিয়াই জানা দরকার। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোমাদের বলিয়া রাখি—এই সমস্ত রোগের জীবাণুই সূর্য্যের আলো, খোলা বাতাস, আর শুকনো হাওয়া সহ্য করিতে পারে না,—বিশেষতঃ সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই ইহারা অতি শীঘ্র মরিয়া যায়। এটা মানুষের পক্ষে ভারি সুবিধার কথা ;—কারণ ঠিক এই দুটী জিনিষ, সূর্য্যালোক ও নির্ম্মল বায়ু মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে অতি উপকারী। আর একটা মস্ত কথা এই যে, জীবাণুঘটিত এই যে সব ভীষণ ভীষণ ব্যাধি—যার এক একটীই ভারতকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করিয়া ফেলিতেছে—ইহাদের প্রত্যেকটী ব্যাধিই প্রতিকার-সাধ্য। মানুষ চেষ্টা

করিলেই যে ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে এ খবর মানুষ আজ জানিতে পারিয়াছে। তবুও যে আজ পর্য্যন্ত এই সব ব্যাধি ভারতকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, ভারতবাসীর নিজেদেরই আলস্য, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাই এর জন্য প্রায় পূর্ণ পরিমাণে দায়ী। তোমরা ভারতের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল, পূর্ব্বপুরুষদের আলস্য ও অজ্ঞতার প্রায়শ্চিত্ত তোমরা করিতেছ। কিন্তু তবু তোমরাও যদি এই মহামারীগুলির মূল কারণ ও প্রতিকারের উপায়গুলি জানিয়া—প্রতিকারসাধনে যত্নবান হও, তবে তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হয়ত আর সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। প্রতি বৎসর অসংখ্য শিশু এই কয়টী মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—অথচ চেষ্টা করিলে ইহাদের অধিকাংশকেই হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—বাঁচান যাইত। এ কথাটী সব সময়েই তোমাদের মনে রাখিতে বলি। আগেই বলিয়াছি,—আলো বাতাস জীবাণুরা সহ্য করিতে পারে না—অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বদ্ধ জায়গার মধ্যেই এরা থাকে ভাল। দুনিয়ার যেখানে যত ময়লা, ধূলা, নোঙরা, পচা জিনিষ আছে—এইগুলি হইল জীবাণুদের আসল আড্ডা। পচা, দুর্গন্ধওলা অন্ধকার জায়গায় থাকিতে পাইলে জীবাণুরা আর কিছু চায় না।

জল নহিলে জীবাণুরা বাঁচিতে পারে না;—আর যদিও বা কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলেও আর বাড়িতে পারে না। খুব ঠাণ্ডাতেও তেমনি জীবাণুরা মরিয়া যায়, নয়ত যেমন ছিল তেমনি থাকে, বাড়িতে পারে না;—তাই ব্যবসার ক্ষেত্রে মাছ, ফল ইত্যাদি জিনিষ বরফের বাক্সে রাখিয়া চালান দেওয়া হয়,—জীবদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য।

জীবাণুদিগকে বধ করিবার সব চেয়ে ভাল উপায় হইতেছে উত্তাপ আগুনে পুড়িলে তো পৃথিবীতে এমন কোন জীবাণু নাই যাহা বাঁচিতে পারে। গরম হাওয়া এবং গরম বাষ্পও অধিকাংশ জীবাণুকেই নষ্ট করে।

এ ছাড়া নানাপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য এবং ঔষধও জীবাণুনাশের এক প্রধান উপায়। ফরমালিন, পোটাশিয়াম্ পারমাঙ্গানেট্, হাইড্রার্জ পারক্লোর প্রভৃতি ঔষধ জীবাণু নাশের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।







মুক্তাকুমারী

[শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী]

[১]

সুখের দেশ পাতালপুরে ড্রাগন রাজার মেয়ে।
একলা থাকে একলা বেড়ায়—হেসে-নেচে-গেয়ে ॥
চাঁদের আলো আঁধার-মলিন রূপের ছটায় তার।
ঝল্‌মলিয়ে আলোক ফুটে, পলায় অন্ধকার ॥
ফুলের সুবাস বয় বাতাসে দেহ হতে ঝরে।
মাতাল করে দেয় সবারে, যে দেখে—প্রাণ হরে ॥
সকলে চায় করতে বিয়ে যত দেবের দল।
ড্রাগন-বালা মুখ ফিরিয়ে হাসে খল্ খল্ ॥

সাগরতলের শুক্তি-নারীরা মুক্তার শেজ বিছাইয়া দেয়—মুক্তার পুষ্পবৃষ্টি করে—মুক্তা সাজাইয়া সম্মুখে রাখিয়া দেয় থরে—থরে—থরে!

রাজকন্যা বড় বড় গুলি বাছিয়া লইয়া হাতে গায়ে গলায় পরে, কাণে দোলায়, কাপড়ে বসায়; থরে—থরে—থরে মুকুটে সাজায়; সাজাইয়া—মুক্তার রাজ্যে—মুক্তার শয্যায়—মুক্তার মুকুট মাথায় পরিয়া, বসে—

মুক্তাকুমারী হইয়া।

আর,—মুক্তা ছড়াইয়া—গড়াইয়া—ছুড়িয়া—লুফিয়া—

হাসে, খেলে, নাচে, গায় সদাই আপন মনে।
মনের কথা কয়না কারে কেহই নাহি জানে ॥

শুক্তি-নারীরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, মৎস্য-নারীরা আদর-সোহাগ করে, আর নিত্য নূতন নূতন গল্প শুনায়।—

পৃথিবীর কথা—মানুষের কথা !

শুনিতে— শুনিতে— শুনিতে মুক্তাকুমারী বিভোর হইয়া যায়।

সাগর-বুকে চাঁদ হাসে, মানুষের নৌকা ভাসে—জাহাজ ভাসে, মানুষেরা যাতায়াত করে—বাণিজ্য করে—যুদ্ধ করে; জলের তলে তাদেব ছায়া পড়ে। মুক্তাকুমারী দেখে আর মনে করে—ওই বুঝি তাবা তাহার কাছে নামিয়া আসিতে চাহিতেছে! মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে—অধীব হয়—হা-প্রত্যাশে চাহিয়া থাকে। ছায়া—তরঙ্গে নাচে; নামে-নামে-নামেনা—কাছে আসে-আসে-আসেনা, দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে—কোথায় চলিয়া যায়। তাহার আশা পূর্ণ হয় না—চোখ দুটি ছল ছল করে। সকলে বুঝাইয়া কহে—

মানুষেরা এখানে আসিতে পারে না।

মুক্তাকুমারী সুধায়—"কেন আসিতে পারে না ?"

না,—দেবতাদেব মানা! তাঁবা পথ-ঘাট আটক করিযা রাখেন—মানুষ আসিলে দেখা দেন না—মারিয়া ফেলেন। তাই তাবা পথের সন্ধান পায় না—ভয়ে আসিতেও চায় না।

মুক্তাকুমারী রাগিল দেবতাদের উপরে; বলিল—

আমি পথ দেখাইব—মানুষ আনিব; তাব সঙ্গে হাসিব খেলিব—মিশিব—থাকিব, দেখিব তাঁরা কি করিতে পারেন ?

এক কাণ—দুই কাণ— তিন কাণ হইল; হইতে হইতে— শেষে কথাটা উঠিল দেবতাদের কাণে।

সকলে রাগিয়া উঠে।—

বটে ?— এত অহঙ্কার মুক্তাকুমাবীব! দেখিব— কি করিয়া পাতালপুবে মানুষ আনে ?

—সকলে বসিলেন পরামর্শ করিতে।

পথ-ঘাট সব দাও বন্ধ কবিয়া। কিন্তু মানুষের অনিষ্ট না হয়,—তা' হইলে তারা আব মানিবে না।

কি উপায় তা হইবে ?

না,—পথ-ঘাট যেমন যেখানে আছে—তেমনি থাকিবে, অথচ মানুষ দেখিবে না, দেখিলেও ভয়ে ঘেঁসিবে না; দাও কোন একটা পরদাব আবরণে ঢাকিয়া!

না,—ডাক তবে শিশিকণাকে!

শিশিরকণা আসিয়া উপস্থিত।



শিশিরকণা আসিয়া উপস্থিত।

"কি সংবাদ,—আমাকে ডাকিয়াছেন কেন?"

না,—"এখন হইতে তুমি ধরায় গিয়া উদয় হইবে, কুয়াশার পরদায় পৃথিবী ঢাকিবে, শিশির ছড়াইয়া পথ-ঘাট ভিজাইবে। মানুষ না এখানকার পথের সন্ধান পায়; পাইলেও—না আসিতে পারে!

সেই হইতে পৃথিবীতে নামিল কুয়াশা!

(২)

—এদিকে হইল কি ? -

বৎসবে একবার করিয়া হয়—চীন সাগবে নৌকাব মেলা।

বেজায় ধুম-ধাম।

যে দেশে যত ভাল ভাল নৌকা আছে—সব আসিয়া জড় হয। যত সুন্দর সুন্দর নৌকা আসিয়া এ উহাব সঙ্গে পাল্লা দেয—বাইচ খেলে—কসবৎ দেখায়। নাচ গান—তামাসা—আমোদ—আহ্লাদের ধুম পড়িয়া যায়। আব তা দেখিবাব জন্য—

দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসে।

চীন সাগবেব তীব গুল্‌জাব হইয়া উঠে—তীবে যেন নগব বসিয়া যায।

কত বাজা আসেন, বাজপুত্র আসেন, বণিক আসেন, সপদাগব আসেন, সেপাই আসেন, সান্ত্রী আসে, গবীব আসেন, গৃহস্থ আসেন, সন্ন্যাসী আসেন, ফকির আসেন, মুটে আসেন, মজুব আসেন।

যাহাব যেমন নৌকা আছে সাজাইয়া গুজাইয়া আনেন। যাহাব নৌকা নাই—তিনি শুধুই দেখিতে আসেন। সেই—

নৌকার মেলা আরম্ভ হইল।



নৌকাব মেলা আবম্ভ হইল।

দেশ-দেশান্তব হইতে নানা বকমেব নৌকা আসিয়া জমিতে লাগিল। সকল নৌকাতেই নানা বকম কবিযা সজ্জিত-অঙ্কিত-খোদিত—ড্রাগনেব মূর্ত্তি।

পত্ পত্ নিশান উড়ে—ঝপ্ ঝপ্ দাঁড় পড়ে—কে জিতে—কে হারে।

লোকে দেখে—বাহবা দেয়—সুখ্যাতি করে—নিন্দা করে—আমোদ আহ্লাদ—চীৎকার কোলাহল—হাসি তামাসা রঙ্গ রহস্তে আকাশ বাতাস ভরিয়া যায়—সাগর তীর জীবন্ত হইয়া উঠে! এখন—

এক বণিক রাজপুত্র আসিলেন—

ড্রাগন তরী সাজাইয়া লইয়া ঠিক—যেন ছবিখানি!

দূর হইতে লোকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল—দূর হইতে বাহবা দিল—চীৎকারে আকাশ ফাটাইল। ড্রাগন তরী ঝপ্ ঝপ্ দাঁড় ফেলিল....তীরবেগে আসিল মেলার মাঝখানে।

সকলে অবাক!

দূর হতে দেখাচ্ছিলো—ছবির মত 'না'।
কাছে এসে হেরে গেল—জিত্তে পারলে না!

লোকে হাসিল—বিদ্রূপ করিল—চীৎকার করিল। লজ্জায় রাজপুত্রের মুখ মলিন হইল—মনে ব্যথা বাজিল—অপমান বোধ করিলেন—রহিলেন মাথা হেঁট করিয়া!

সকলে আবার দেখিল—নৌকা হারিল বটে, কিন্তু রাজপুত্র পরম সুন্দর। হাজার হাজার লোক জমিয়াছে—দলে দলে রাজা—রাজপুত্রগণ আসিয়াছে;—কিন্তু তেমন সুন্দর পুরুষ একজনও নয়!

লোকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল—শত মুখে সুখ্যাতি উঠিল—চারিদিকে কথা ছুটিল। কিন্তু রাজপুত্র চাহিলেন না—হাসিলেন না—আহ্লাদ করিলেন না; রহিলেন মলিন মুখে চুপ্টি করিয়া বসিয়া!

তাঁহার নৌকা হারিয়াছে—মান গিয়াছে—তার কোন কিছু ভাল লাগিতেছে না। মাঝি-মাল্লাদের বলিলেন—

"তোমরা নৌকা লইয়া ফিরিয়া যাও, আমি এ নৌকায় আর যাইব না; আমি চলিলাম স্থলপথে হাঁটিয়া।"

রাজপুত্র নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিলেন

চারিদিকে ভিড় জমিল লোকে দেখিতে জড় হইতে লাগিল। কোন দিকে চাহিলেন না; তাড়াতাড়ি—সাগর তীর ছাড়িয়া পড়িলেন মাঠে; মাঠ ছাড়াইয়া—চলিলেন—বনজঙ্গল পাহাড় পথ ধরিয়া। লজ্জায় কাহাকেও আর মুখ দেখাইতে চাহেন না—যেদিকে নির্জ্জন দেখেন—চলেন সেই দিকে।

এদিকে,—দিন গেল, সন্ধ্যা আসিল—কুয়াসায় ধরা ছাইল।

কোলের মানুষ দেখা যায় না!

(৩)

রাজপুত্র থামেন না!

চলেন—চলেন—কেবলই পথ চলেন কুয়াসার আবরণ ঠেলিয়া। চোখে দেখিতে পান না—কোথায় কি আছে বুঝিতে পারেন না; তবু পথ চলেন—হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া—নিবিড় কুয়াশার ভিতরে।

নৌকার মেলায় হারিয়াছেন—অপমান হইয়াছে—লোকালয়ে মুখ দেখাইতে চাহেন না—ভয়-ভাবনা ঘুচিয়াছে—মোরিয়া হইয়া—ক্রমাগতই চলিয়াছেন কুয়াশার ভিতর দিয়া—ঠিক যেন—

অন্ধের মত!

চলিতে—চলিতে—চলিতে—পথ গেল হারাইয়া, আসিয়া পড়িলেন—লোকালয়ের দূরে দূরে—বহুদূরে—তেপান্তর মাঠের ধারে এক জংলা—নির্জ্জন—ভয়ঙ্কর

পাহাড়ের কাছে!

হঠাৎ পায়ে বিষম হোঁচট লাগিল—সর্ব্ব শরীর ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া উঠিল—মুখ দিয়া যাতনার শব্দ বাহির হইল; ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন একটা ঢিবির উপরে।

শিশিরে মাথা ভিজিয়াছে পোষাক ভিজিয়াছে, হাত পা অসাড় হইয়া আসিতেছে—মাথা—ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতেছে—আর উঠিবার কি নড়িবার-চড়িবার শক্তি নাই!

চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিলেন!

এখানে বিকট শব্দ—ওখানে বিকট শব্দ—সেখানে বিকট শব্দ। সম্মুখে বিকট শব্দ—পিছনে বিকট শব্দ। আশ-পাশে চারিদিক হইতে—বিকট শব্দ উঠে!

রাজপুত্র চমকিয়া উঠেন—এদিকে চান—ওদিকে চান—সেদিকে চান; কিছুই দেখেন না—চারিদিকেই—

গাড় কুয়াশার আবরণ!

চোখ চলে না—অনুমান হয় না—বুঝিতে পারেন না। কেবলই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহেন।

চাহিতে—চাহিতে—চাহিতে

হঠাৎ নজর পড়িল—পাশের দিকে—ঠিক পায়ের গোড়ায়।

—বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন:—

একখানি—মস্ত বড়—প্রকাণ্ড—আয়না পাতা রহিয়াছে। বিষম চক্‌চক্‌ করে—ঝক্‌ ঝক্‌ করে—জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিয়া জ্বলে—চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া দেয়। কুয়াশার অন্ধকারে আর কোথাও চোখ চলে না—কিন্তু সে দিকে চোখ পাতিয়া রাখা মুস্কিল।—

এমনি উজ্জ্বল!

রাজপুত্র নীচু হইয়া হাত দিলেন; অমনি আর্শিখানা যেন গলিয়া তরল হইয়া গেল—নড়িল—কাঁপিল—চঞ্চল হইয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। ঠাহর করিয়া—করিয়া—করিয়া, বুঝিলেন—

আয়না নহে—আর্শি নহে—জল—স্বচ্ছ জল!

আজ্‌লা করিয়া তুলিলেন—ফেলিলেন—শব্দ হইল—হিল্লোল উঠিল—মৃদু তরঙ্গ ছুটিয়া—ছুটিয়া—মিলাইল। আর অমনি,—চারিদিকে যেন কিসের আলো ঠিক্‌রাইয়া খেলিতে লাগিল।

রাজপুত্র ঠাহর করিয়া—করিয়া—করিয়া বুঝিলেন—বসিয়াছেন একটা প্রকাণ্ড কূপের পাড়ে;—পাড়টা উঁচু নীচু পাথরের তৈরী; আর তার কানায়—কানায় ভরা স্বচ্ছ জল।

জল বিষম উজ্জ্বল

যেন,—ভিতরে আগুন জ্বলিতেছে; আগুনের ছটা উঠিতেছে জল ফুঁড়িয়া উপরে—চোখ ঠিকরাইয়া যায়—চাহিয়া থাকা যায় না। তবু রহিলেন চাহিয়া! হঠাৎ চোখে পড়িল—অতি আশ্চর্য্য—অতি বিচিত্র—

অবাক্ কাণ্ড!

[৪]

জলের তলে আলোয় গড়া—
কার মোহিনী ছবি,
ঢেউ দিয়ে রূপ উঠ্‌ছে ফুটে—
মূক হয়ে যায় কবি!
অমল ধবল মতির মাঝে—
মুক্তা রাশি গায়,
মুক্তা সেযে—মতির ঝারা
মতির খেলা তায়!
মুক্তা-মুকুট মাথায় দিয়ে
মতির হাসি ঝরে—
মতির দেশে—মুক্তা-রাণী
কার কামনা করে?

রাজপুত্র নির্ব্বাক—নিস্পন্দ—জড়সড়!—

জড়ের মতই রহিলেন বসিয়া! হাত নড়ে না—পা নড়ে না—দেহ নড়ে না—চোখের পলক পড়ে না ঠিক যেন—

পাথরে গড়া প্রতিমূর্ত্তি!

চোখের দৃষ্টি একভাবে রহিল গাঁথা হইয়া—জলের ভিতরে—মুক্তার রাজ্যে—মুক্তার রাশির মাঝে সেই—

মুক্তা-কুমারীর দিকে!

চারিদিকে কুয়াশার আবরণ—জলের ভিতরে মুক্তাকুমারীর রূপের জাল। জাল ফুটিয়া উঠে—জলের উপরে রূপের কিরণ ছড়ায়—ঢেউয়ে ঢেউয়ে রূপ হিল্লোল তুলিয়া—নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, আর রাজপুত্রকে—

টানে—টানে—টানে!—

কেবলই টানিতে থাকে—আকর্ষণ করিয়া লয়!

বিষম আকর্ষণের জোর!

রাজপুত্রকে টানিয়া লইতে লাগিল। রাজপুত্র বুঝিলেন না—জানিলেন না—টের পাইলেন না—ধীরে—ধীরে—ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চোখের দৃষ্টি পড়িয়া রহিল ঠিক—তেমনি একই ভাবে জলের ভিতরে।

মুক্তাকুমারী হাসিল।

যেন,—বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—ঝল্-মল্ করিয়া—চোখ ধাঁধিয়া—মন গলাইয়া; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কে যেন টানিতে লাগিল তাঁহাকে জলের ভিতর দিকে।

রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু পা বাড়াইতে লাগিলেন—ধীরে—ধীরে—ধীরে—একটু একটু করিয়া—

কলের পুতুলের মত

ততই জোর—ততই জোর—ততই জোর! ততই—জোরে—জোরে—জোরে—কে যেন তাঁহাকে লাগিল টানিতে।

রাজপুত্র অজ্ঞান—অচৈতন্য—বিহ্বল!—

টের পাইলেন না—নামিলেন জলে। পা ডুবিল—কোমর ডুবিল—বুক ডুবিল—গলা ডুবিল—কিন্তু রাজপুত্র টের পাইলেন না।

গা ভিজিল না—জল যেন দুই পাশে সরিয়া মাঝখানে—পথ করিয়া দিল। রাজপুত্র মাথা ডুবাইলেন—বুঝিতেও পারিলেন না—চুলের ডগাটি অবধি ভিজিল না; চলিলেন সুন্দর—অদৃশ্য—অচেনা পথে—পাতাল পুরীর দিকে।

মুক্তাকুমারীর হাত ধরিল!

রাজপুত্র সকল ভুলিলেন। পৃথিবীর কথা—দেশের কথা—বাড়ীর কথা—মা বাপের কথা—নিজের কথা—কিছুই মনে রহিল না; চলিলেন—মুক্তাকুমারীর সঙ্গে বরাবর নামিয়া।

(৫)

সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর—চারিদিকে সুন্দরের রাজত্ব!

রাজপুত্র যত যান—

ততই সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর—সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি—সৌন্দর্য্যের বিস্তার—সৌন্দর্য্যের প্লাবন! শোভা সৌন্দর্য্য—সুষমার ছড়াছড়ি—গড়াগড়ি! সম্মুখে—পিছনে—আশে—পাশে—উপরে—নীচে—আকাশে—বাতাসে—দৃশ্যে—অদৃশ্যে—কেবলই—

সৌন্দর্য্য—সুষমা!

শোভা সৌন্দর্য্য-সুষমায় ভাসিয়া—ডুবিয়া—গড়াইয়া—হাবুডুবু খাইয়া—রাজপুত্র চলিলেন মুক্তা কুমারীর হাত ধরিয়া—বরাবর পাতাল পুরীতে। অমনি—

হাসি—গান—গন্ধ—আলো!

চারিদিক উজ্জ্বল—চারিদিক ঝল্‌মল্‌—চারিদিক আমোদিত করিয়া—

চারিদিকেই অপূর্ব্বঝঙ্কার উঠিল।

হাসির ঝঙ্কার—গানের ঝঙ্কার—গন্ধের ঝঙ্কার—রূপের ঝঙ্কার!

—ঝঙ্কারে—ঝঙ্কারে—ঝঙ্কারে—

পাতালপুরী ঝঙ্কৃত—আমোদিত—উথলিত—মুখরিত হইল!

ড্রাগনেরা হাওয়ার ভরে আসিল—চারিদিক বেড়িল; কিন্তু রহিল দূরে—দূরে—দূরে—কাছে ঘেঁসিতে পারিল না—রহিল অবাক্ হইয়া চাহিয়া। তাহারা অবাক্ হইয়া দেখে—

—পরম সুন্দর রাজপুত্র!

অপরূপ সুন্দরী—মুক্তাকুমারীর উপযুক্ত বর বটে। সকলে এক বাক্যে কহিল—"হাঁ। যুগল মিলিয়াছে ঠিক!"

—পাতালপুরে আনন্দের তুফান ছুটিল!—

মুক্তাকুমারীর সঙ্গে—রাজপুত্রের—হইয়া গেল মহা ধুমধামে বিবাহ!

বর কনে গিয়া বসিল—

মুক্তার পুরীতে—মুক্তার শয্যায়—মুক্তার বাসরে!

(৬)

দিন কাটিতে লাগিল।

রাজপুত্র—আপনাকে ভুলিয়া—মুক্তাকুমারীর সঙ্গে পাতালপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

—কিছুরই অভাব নাই !—

যা' চাহেন—তাহাই পান, যাহা ইচ্ছা—তাহাই করেন। চারিদিকে ড্রাগন দাসদাসীরা সর্ব্বদা হাত জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—যা হুকুম করেন—তাহাই করে। মুক্তাকুমারী সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে—

—ছায়ার মত! -

যখন যেখানে যাইতে ইচ্ছা হয়, সেইখানে লইয়া যায়, যা দেখিতে ইচ্ছা হয় তাহাই দেখায়।

রাজপুত্র কত নূতন নূতন ব্যাপার দেখেন, কত নূতন নূতন সামগ্রী দেখেন, কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দেখেন, কত চমৎকার চমৎকার দৃশ্য দেখেন।

দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে—

দিন কাটে—রাত্রি কাটে, আবার দিন কাটে—আবার রাত্রি কাটে। দিবারাত্রি সমান ভাবে কাটিয়া যায়, তিনি কিছুই বুঝিতে পারে না—জানিতে পারেন না—টের পান না; থাকেন—অস্টপ্রহর—ঠিক যেন—

স্বপ্নের ঘোরে বিভোর হইয়া!

চোখের উপরে—চারিদিকে—কেবলই সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া বেড়ায়, সৌন্দর্য্যের হিল্লোল উঠে—তুফান ছুটে! রাজপুত্র—হাবুডুবু খান!

রূপ সাগরে রূপের লহর
রূপের তুফান ছুটে।
হিল্লোলেতে কাঁপিয়ে ছটা
ঝল্‌মলিয়ে ফুটে!

রাজপুত্র রূপ-সাগরে ডুবিয়া থাকেন!

সাগরতলে মতির রাজ্যে বেড়াইতে যান, শুক্তি-নারীরা আদর করিয়া মুক্তার সিংহাসনে বসায়; মৎস্য-নারীরা আসিয়া গান করে—গল্প করে—রূপ ছড়াইয়া—মাতাইয়া রাখে!

রাজপুত্র ভুলিয়া থাকেন।

—থাকিতে—থাকিতে—থাকিতে—

দিন কাটে—মাস কাটে—বছর কাটিয়া যায়!

একটি—দুইটি—তিনটি বছর কাটিল।

আবার, পৃথিবীর উপরে—চীন সাগরে—নৌকার মেলা সুরু হইল; তরঙ্গের তলে নানা রকমের ছায়া নামিল—মৎস্য-নারীরা—দল বাঁধিয়া দেখিতে গেল; দেখিয়া আসিয়া—গল্প করিতে বসিল।

রাজপুত্র মন দিয়া শুনেন।

শুনিতে—শুনিতে—শুনিতে—হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল পূর্ব্বের সকল কথা,—খেলার কথা—নৌকার কথা—নিজের কথা—দেশের কথা! অমনি উঠিলেন চমকিয়া!—

কে তিনি—কোথায় আসিয়াছেন!

রাজপুত্রের মুখ শুকাইল—বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিল—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিতে লাগিলেন চারিদিকে।—

আশ্চর্য্য স্থান—আশ্চর্য্য পুরী—আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—শুক্তি-নারী—মৎস্য-নারীর দল চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; আর তাহাদের মাঝখানে—

—ঠিক তাঁহার পাশটিতে বসিয়া—

সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য—সকলের চেয়ে সুন্দরী—সকলের চেয়ে বলিহারী—অপূর্ব্ব—অতি অপূর্ব্ব—মুক্তা কুমারী!

(৭)

রাজপুত্র বারম্বার চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া চাহেন, ভাবেন,—

মুক্তাকুমারী

কিন্তু, স্বপ্ন ছুটে না—চক্ষের উপরে কেবলই দেখিতে পান—সেই এক দৃশ্য—সেই এক ছবি—একই ঘটনা।

কিছুই বুঝিতে পারেন না—কেমন করিয়া কি হইল; কেবলই চাহিয়া থাকেন অবাক্‌ হইয়া। মুখে কথা ফুটে না—শব্দ বাহির হয় না, কেবলই থাকেন বিস্ময় ভরে চাহিয়া!

মুক্তাকুমারী সুধায়—"কি হইল?"

শুক্তি-নারীরা সুধায়—"ভাবিতেছেন কি?"

মৎস্য-নারীরা সুধায়—"হঠাৎ এমন হইলেন কেন ?"

শুন্‌তে গিয়ে ধরার ধারা—
নরের মজার কথা,
জাগ্‌লো প্রাণে কাহার আঁখি—
বাজ্‌লো কিসের ব্যথা !
ব্যথা হারা—সুখের দেশে—
মুক্তা-নারীর ঘর,—
হাসি, আলো, গন্ধে আকুল
সদাই ভর-ভর !
নিতুই নরের সাধনার ধন—
সেই দেশেতে রাজা !
বামে রাণী—হেম বরণী,
আমরা সবাই প্রজা !
সেই সাধনার দেশে এসে
কাতর কিসের তরে,
সকল সুখের রাজা তুমি
ভাস সুখের সরে !

রাজপুত্র তবু কথা কহেন না, চক্ষু দুটি ছল ছল করে—কাতর দৃষ্টিতে চাহিতে থাকেন সকলের মুখের দিকে।

চাহিতে—চাহিতে—চাহিতে—

তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। মুক্তা-কুমারী অনুমান করিয়া বুঝিলেন, বুঝিয়া,—বলিলেন—

"হেথায় একই সুখের ছবি—মন ভরেছে তায়।
নূতন কিছু দেখতে তোমার প্রাণ কি আজি চায় ?"

তখন, রাজপুত্রের কথা ফুটিল। বলিলেন—

"হাঁ—ঠিক ধরিয়াছ, পৃথিবীর বুকে নিত্যই প্রকৃতির নূতন নূতন ছবি ফুটে—নিত্যই নূতন নূতন দৃশ্য দেখা যায়, তাই মানুষ কুতূহলে বাস করে। হেথা—একই দৃশ্যে—একই সুখে—মন অসাড় হইয়া আসে—অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমার আর মন চাহে না এখানে থাকিতে, সদাই প্রাণ চাহে পৃথিবীর উপরে যাইতে। আমাকে সেইখানে পৌঁছাইয়া দাও।"

সকলে উঠিল চমকিয়া—

সকলেরই বুকে ব্যথা বাজিল, মন দমিয়া গেল, হাসি লুকাইল, গান ফুরাইল, সকলেই লাগিল বুঝাইতে—

"সুখের দ্বীপে আসার তরে সাধনা নর করে।
এসে হেথায় চাও কেন গো যেতে ধরায় ফিরে?
দুঃখ-শোকে মলিন ধরা—মানব সহে তাপ।
সদাই আঁধার রাশি তথায়—সদাই পীড়ে পাপ॥
দুঃখের পীড়ন জীবন-মরণ সদাই ভ্রমে যথা,
সাধ করে হায় ফিরে গিয়ে কি সুখ পাবে তথা?"

—না,—

"আঁধার যদি না রয়, তবে আলোর শোভা কোথা?
আরাম কোথায়—মাঝে যদি না দেয় পীড়া ব্যথা?
হাসির বাহার কোথায় যদি না রয় চোখে জল,
সুখে মাঝে দুখ্ না এলে তিক্ত যে কেবল!
একই ভাবে—একই স্রোতে জীবন যাহার বয়
স্বাদ কভু তার পায়নাকো সে—মৃতের সমান রয়!

শুনিয়া সকলে স্তব্ধ!

কাতরে চাহিয়া রহিল মুখের পানে—মিনতি করিয়া কত বুঝাইতে লাগিল। রাজপুত্র বুঝিলেন না—কথায় কাণ দিলেন না—কেবলই বলিতে লাগিলেন—

আমি পৃথিবীর উপরে যাইব!

—বুঝাইয়া—বুঝাইয়া—বুঝাইয়া—

সকলে হারিয়া গেল, মুক্তাকুমারীও হারিলেন,—হারিয়া,—হতাশ হইয়া বলিলেন—

"আচ্ছা চল, আগে সুখের দ্বীপ স্বচক্ষে দেখিবে চল, মানুষ যেখানে আসিবার জন্য সাধনা করে—তোমাকে সেইখানে লইয়া যাইব। ধরায় যাইতে চাহিও না।"

বলিয়া,—মুক্তাকুমারী রাজপুত্রকে লইয়া চলিল।

রাজপুত্রের চোখের উপরে যেন কিসের আবরণ পড়িল, কিছুই দেখিল না—বুঝিল না—জানিতে পারিল না। হঠাৎ চারিদিক ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল—

তাপ-বিহীন উজ্জ্বল আলোক!

মুক্তাকুমারী বলিলেন—"এই দেখ, মানুষের সাধনার দেশ—সুখের দ্বীপ! দুঃখ নাই—শোক নাই—সন্তাপ নাই—জরা নাই—মরণ নাই—সুখের রাজ্য। সুখের দ্বীপে চিরসুখী মানুষেরা অনন্ত সুখে রহিয়াছে!"

—রাজপুত্র—স্তম্ভিত মুগ্ধ।—



সুখের দ্বীপ।

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখেন—দেখেন—কেবলই দেখেন।

প্রবেশের পথ পান না—

কেবলই আশে পাশে—ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখেন;—আর মুক্তাকুমারীর মুখের পানে চাহেন।

(৮)

তিন দিন—তিন রাত্রি কাটিল।

রাজপুত্রের দেখা ফুরাইল—কিছুতে প্রবেশ করিবার পথ দেখিতে পাইলেন না,—আসিলেন মুক্তাকুমারীর সঙ্গে আবার পাতালপুরীতে ফিরিয়া।

মুক্তাকুমারী বলিলেন—"জীবনের কাজ ফুরাইলে—সকল কর্ত্তব্য শেষ হইলে—তখন সুখের দ্বীপে প্রবেশ করিবার পথ দেখা যাইবে। এখন—আমাদেরও যাইবার অধিকার নাই, দেখিতে পাই—এই মাত্র। ততদিন এখানে থাকিতে হইবে।"

—রাজপুত্র মানে না।—

পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য কেবলই ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন।

আহার নাই—নিদ্রা নাই—কথা নাই—বার্ত্তা নাই—আনন্দ নাই—ভ্রমণ নাই—কিছুই নাই! কেবলই আকুল হইয়া ছট্‌ফট্ করেন আর পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে চাহেন।

মুক্তাকুমারী কিছুতেই থামাইতে পারেন না।

—করেন কি?—

অনেক ভাবিয়া—ভাবিয়া—শেষে বলিলেন—

"একান্তই কি আর এখানে থাকিবে না?"

"না—কিছুতেই না, আর এখানে থাকিতে আমার মন চাহিতেছে না—পৃথিবী দেখিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে—কিছুতে মন ফিরাইতে পারিতেছি না।

না,—"যদি সুখের দ্বীপে যাইতে পাও?"

"তবুও না—এখন আর থাকিতে পারি না—একবার পৃথিবীতে যাইতেই হইবে—নহিলে বাঁচিবনা।"

না,—"তবে চল, আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল।"

"এ্যাঁ—তুমি সঙ্গে যাইবে?"

না,—"হ্যাঁ—নিশ্চয় যাইব,

পতি তুমি, পত্নী আমি—বাঁধা তোমার সনে,
কঠিন ডোরে প্রেমের হারে সারাটি জীবনে।

যেথায় যাবে রইব সেথায় ছায়ার মত সাথে,
তোমার আমি অনুগামী সদাই দিবস রাতে।"

রাজপুত্রের ভারী আহ্লাদ।—

অনেক দিনের পর মুখে হাসি ফুটিল—কথা সরিল—উৎসাহ ফিরিল; বলিলেন;—

"তবে আর দেরী কেন—শীঘ্র চল।"

না,—"আর দু'দিন অপেক্ষা কর—আয়োজন করি!"

মুক্তাকুমারী যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন, সকলের কাছে বিদায় লইলেন,—লইয়া,—গোপনে ডাকিলেন, তাঁহার অনুগত এক ড্রাগনকে।

"কি আদেশ রাজকুমারী?"

না,—"স্বামীর সঙ্গে তার দেশে যাইব, আমাদের দুইজনকে লইয়া—সাগর পারে—পৃথিবীর উপরে তুমি পৌঁছাইয়া দিবে।"

"তার জন্য চিন্তা কি? আমার পীঠের উপরে দুইজনে বোস—হাওয়ার ভরে—শূন্যে উড়িয়া এখনি পৃথিবীতে রাখিয়া আসিব।"

"না—না—তা হইবে না, রাজপুত্র জানিতে পারিবেন—ভয় পাইবেন—আমার প্রতি আকর্ষণ থাকিবে না।"

"তবে বল—কি করিতে হইবে?"

"তুমি এক প্রকাণ্ড 'ওয়ানির' রূপ ধর, আমরা তোমার পীঠে চড়িব—তুমি আমাদের সাগর পার করিয়া দিবে।"

ড্রাগন দাস তখনি গিয়া এক প্রকাণ্ড কুমীরের রূপ ধরিল। মুক্তাকুমারী রাজপুত্রকে লইয়া—চড়িয়া বসিল সেই 'ওয়ানির' পীঠে—ওয়ানি পৌঁছাইয়া দিল—সাগর পারে—পৃথিবীর উপর।

রাজপুত্র—সাগরতীরে—সুন্দর বাড়ী করিলেন, করিয়া দুই জনে বাস করিতে লাগিলেন সেই বাড়ীতে।

(৯)

একটি বোঁটায় দু'টি ফুল।

দুইজনের তেমনি চেহারা—তেমনি রূপ—তেমনি ভাব।

এক সঙ্গে থাকেন—এক সঙ্গে বেড়ান—এক সঙ্গে উঠেন—বসেন—হাসেন—খেলেন। কেহ কাহাকেও চক্ষের আড় করেন না।

যে দেখে— তার চক্ষু জুড়ায়।



একটি বোঁটায় ছটি ফুল।

রাজপুত্রের সর্ব্বদাই চেষ্টা—কিসে মুক্তাকুমারী সুখে থাকিবেন।

মনের ইচ্ছা মুখে ফুটিতে না ফুটিতে তখনি তা' পালন করেন। দাস-দাসী থাকিতেও নিজে মুক্তাকুমারীর সেবা যত্ন করেন—নিজের হাতে করিয়া খাবার দাবার আনিয়া দেন—সখের জিনিস আনিয়া দেন—ফুল আনিয়া পরাইয়া দেন! আর—দিবারাত্রি রাখেন—

চোখে—চোখে—চোখে।

গান করেন—গল্প করেন—নানা দৃশ্য দেখাইয়া বেড়ান। একদণ্ড কাছছাড়া হইয়া কোথাও যান না।

সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটে।

কাটিতে—কাটিতে—কাটিতে—অনেক দিন চলিয়া গেল।

এখন হইল কি?—

না,—মুক্তামুকুমারীর ছেলে হইবে। তখন তাঁহার মনে ভয় হইল। ভাবিলেন যে—যদি রাজপুত্র জানিতে পারেন যে—তিনি মানুষ নহেন—ড্রাগন-কুমারী, তা হইলে হইবে কি?

—রাজপুত্র ভয় পাইবেন।

তাঁহার ভালবাসা থাকিবেনা—স্নেহ-যত্ন থাকিবে না—আদর-আপ্যায়ন থাকিবে না—কিছুই থাকিবে না। হয় তো বা—

পলাইয়া যাইবেন।

করেন কি?—

ভাবেন—ভাবেন—ভাবেন—কেবলই উপায় ভাবেন।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করেন—"আজকাল অত ভাব কি? তোমার কি হইয়াছে আমাকে বল।"

মুক্তাকুমারী বলেন—"বলিব—বলিব—আজ নয়—আর এক দিন।"

কিন্তু, কিছুই বলেন না—কেবলই ভাবিতে থাকেন।

ভাবিতে—ভাবিতে—ভাবিতে—শেষে উপায় স্থির হইল, বলিলেন—

"আমার আলাদা ঘর করিয়া দাও; কেহ তার ত্রিসীমানাতেও যাইতে পারিবে না—সেই ঘরে আমি একেলা থাকিব। যতদিন না ছেলে হয়। তুমিও সে ঘরে যাইতে পাইবে না, তার পাশের ঘরে থাকিবে—আমি ডাকিলে তবে ঘরে ঢুকিবে—যতক্ষণ না ডাকিব, ততক্ষণ ঢুকিবে না—প্রতিজ্ঞা কর। কিন্তু সাবধান প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে আর আমাকে পাইবে না—তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব—আর দেখা পর্য্যন্ত পাইবে না।"

রাজপুত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, করিয়া,—আলাদা ঘর করিয়া দিলেন, ঘরে,—জিনিষপত্র গুছাইয়া দিলেন। মুক্তাকুমারী সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

রাজপুত্র একেলা রহিলেন পাশের ঘরে।

(১০)

রাজপুত্র অধীর—ছট ফট্ করেন।—

ভাবেন—মুক্তাকুমারী একেলা করেন কি?

ভাবিয়া—ভাবিয়া—কুল পান না—কিছুই বুঝিতে পারেন না—কেবলই ভাবনা বাড়ে—আস্থির হন—কিছুই স্থির করিতে পারেন না—কেবলই কৌতুহল জাগে।

—মনে বিষম কৌতুহল।—

ইচ্ছা হয়—উকি মারিয়া দেখেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে, আর ভরসা পান না ; কেবল থাকেন

—কাণখাড়া করিয়া— ।—

কখন মুক্তাকুমারী ডাকেন।

কিন্তু—মুক্তাকুমারীর সাড়াশব্দটিও পান্ না। তবুও, পারেন না দূরে যাইতে। কেবলই মনে হয় এখনি মুক্তাকুমারী ডাকিবে। দিবারাত্রি দোরের পাশে কাণ খাড়া করিয়া থাকেন।

থাকিতে—থাকিতে—থাকিতে—এক কাণ্ড হইল। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন—মুক্তাকুমারীর ঘরের ভিতরে এক

—অতি অদ্ভুত কণ্ঠস্বর !—

ঠিক যেন শিশুর রোদন !—কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বরের মত নহে—যেন—কেমন কেমন—অতি অদ্ভুত অত্যন্ত বিচিত্র।

যেমন কঠোর তেমনি কোমল।—

যেমন কর্কশ—তেমনি তীক্ষ্ণ—তেমনি ভয়ঙ্কর—কিন্তু আবার তেমনি কোমল—তেমনি অন্তরভেদী।

বুক কাঁপিয়া উঠিল !—

রাজপুত্র দাঁড়াইলেন স্তম্ভিত হইয়া।

আবার—আবার—আবার—সেই অদ্ভুত ব্যাপার। সেই—

বিচিত্র—ভীষণ - কণ্ঠস্বর !

রাজপুত্রের দেহ কণ্টকিত হইল, মহাভয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—থর্থর্ করিয়া—বাঁশপাতার মত ! ভাবিলেন—না জানি মুক্তাকুমারীর—কি ভয়ঙ্কর

বিপদ ঘটিয়াছে !

আর পারিলেন না স্থির হইয়া থাকিতে, শশব্যস্তে দরজা ঠেলিয়া—চাহিলেন ঘরের ভিতরে অমনি চোখে পড়িল এক ভয়ানক—

—আশ্চর্য্য ব্যাপার !—

এক অতি ভীষণ আকৃতি ড্রাগন কন্যা—সদ্য-জাত—একটি শিশুকে—কোলে করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই তো—

রাজপুত্রের চক্ষুঃস্থির !

রহিলেন স্তম্ভিত হইয়া—পাথরের মূর্ত্তির মত—দাড়াইয়া।—

নিথর নিস্পন্দ স্তব্ধ।

ড্রাগনবালার দুই চক্ষু দিয়া আগুনের হল্কা ছুটিয়া বাহির হইল—রাগে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—

"ধরার মানুষ প্রতিজ্ঞাটী রাখ্লে বটে বেশ।
এতদিনে তোমার আমার সব সম্পর্ক শেষ॥

মুক্তাকুমারী—আগুনের শিখা ছড়াইয়া—তখনি শূন্যে উঠিল, উঠিয়া,—তাহার শিশুকে লইয়া—মেঘের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল ;

রাজপুত্র পড়লো বসে—ধরে নিজের মাথা।
ফুরিয়ে গেল গল্প আমার—মুক্তা-রাণীর কথা॥



কয়লার গ্যাস

—:০:—

দুইশত বৎসর আগেকার কথা—ইংলণ্ডের উত্তর ভাগে ওয়াশিংটন নামে এক ক্ষুদ্র নগরের লোকেরা বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তথায় একটী পুরাতন অব্যবহৃত কূপ ছিল। উহা হইতে অতি জঘণ্য দুর্গন্ধময় গ্যাস উঠিয়া তাহাদিগকে বড়ই বিব্রত করিতেছিল। সকলেই জানেন পুরাতন অব্যবহৃত কূপের ভিতর গ্যাস জন্মে—কিন্তু এ গ্যাস সে রকমের নয়। ইহা এক নূতন রকমের! এ যাবৎ কোন কূপ হইতে তাহারা এরূপ গ্যাস বাহির হইতে দেখে নাই। অথচ কেহই কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না।

কয়েক বৎসর পরে রেভারেণ্ড ডাক্তার জন ক্লেটন নামে একজন পাদ্রী এ সংবাদ অবগত হইলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে অনেক কয়লার খনি আছে। তাঁহার ধারণা জন্মিল এ গ্যাস নিশ্চয় কয়লা হইতে জন্মিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি কিছুক্ষণ উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া সেই কূপের মুখের কাছে ধরিলেন। আর যায় কোথায়! একটা ভীষণ শব্দ হইয়া সেই কূপের মধ্য হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইল। নগরের লোক যাহারা ডাক্তারের সঙ্গে ছিল তাহাদের মনের অবস্থা সহজেই বুঝিতে পার। তাহাদের ধারণা জন্মিল যে ইহা এক ভৌতিক কাণ্ড। ভয়ে তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল। তাহারা গ্যাসের নাম রাখিল ভৌতিক বাষ্প (Sprit Gas)।

ডাক্তার গৃহে ফিরিয়া গিয়া কয়লা চোঁয়াইয়া গ্যাস প্রস্তুত করিবার জন্য একটী ছোট উনুনের মত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি উহা দ্বারা গ্যাস প্রস্তুত করিয়া দেখিলেন যে সেই গ্যাসও জ্বলে। তখন তিনি উহা ছোট ছোট রবারের থলিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন—এবং লোকজন একত্রিত হইলে এক একটা

থলিতে ছুঁচ দিয়া একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া ঐ গ্যাস জ্বালাইয়া তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতে লাগিলেন। তখন লোকে বুঝিল যে মানুষ ইচ্ছা করিলে ভৌতিক বাষ্প তৈয়ার করিতে পারে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতের সুবিখ্যাত বিজ্ঞান সভা রয়েল সোসাইটীর সভ্যগণের সমক্ষে একটী বক্তৃতা এবং তৎসঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দ্বারা এ বিষয় সপ্রমাণ করেন। তখন কে জানিত যে এককালে এই গ্যাস সভ্যজগতের অন্ধকার দূর করিবে। সকলে ইহাকে একটা চমৎকার তামাসার জিনিস বলিয়াই ভাবিয়া লইয়াছিল। তাই ডাক্তার ক্লেটনের আবিষ্কারের পর একশত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে এই গ্যাসকে কাজে লাগাইতে পারে নাই। ডাক্তার ক্লেটনও দেখিয়াছিলেন যে কয়লা চোঁয়াইবার সময়, গ্যাস জন্মিবার আগে একপ্রকার কাল ঘন তেলের মত জিনিষ নির্গত হয়—যাহাকে আমরা আলকাতরা বলিয়া জানি। তিনি এই নূতন জিনিষটীর সম্বন্ধে কোনই গবেষণা করিয়া যান নাই, ইহাকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উইলিয়ম মার্ডক নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার নিজের বাড়ীতে গ্যাসের আলো জ্বালিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীও আশপাশের লোকেরা তো ভয়েই অস্থির। সর্ব্বনাশ! ভৌতিক বাষ্প জ্বালাইয়া আলো করা! ভূত চটিয়া না জানি কি সর্ব্বনাশই করে। ব্যাচারিদের এমন অবস্থা হইল যে তাহারা ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে না। মার্ডক দেখিলেন লোকের ভয় ভাঙ্গিতে না পারিলে কোন কাজই হইবে না। তিনি তখন (উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) সোহো নামক স্থানে গ্যাসের আলোর এক প্রদর্শনী খুলিলেন। ইহার ফলে অনেকে নিজের নিজের বাড়ীতে ও কারখানায় গ্যাসের আলোর প্রতিষ্ঠা করিল। তাহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের প্রয়োজন মত গ্যাস প্রস্তুত করিয়া লইত। তথাপি সাধারণভাবে গ্যাসের ব্যবহার প্রচলিত হইল না। অনেকে অনেক রকম আপত্তি উপস্থিত করিতে লাগিল। কেহ বলিল এই গ্যাস হইতে আগুন লাগিতে কতক্ষণ। কেহ বলিল রাত্রিতে যখন ঘরের দ্বার রুদ্ধ থাকে সেই সময় যদি গ্যাস কোন রকমে বাহির হইয়া ঘরে প্রবেশ করে তবে দম আটকাইয়া মারা যাইব! এতদিন লোকে তিমির তেলের আলো জ্বালিত। একদল বলিল—গ্যাসের আলো ব্যবহার করিলে ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ ঘটিবে—কেন না লোকে আর তিমির তেল সংগ্রহ করিবার জন্য তিমি শিকারে যাইবে না। তিমি শিকারের জন্য যে সকল নাবিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তাহাদের মধ্য হইতেই নৌসেনা বাছিয়া লওয়া হয়। তিমি শিকার উঠিয়া গেলে লোকে নৌবিদ্যা শিখিবেই বা কোথায় আর অশিক্ষিত নাবিক লইয়া যুদ্ধজাহাজ পূর্ণ করিলে ইংলণ্ডের সমুদ্রের আধিপত্য কয় দিন থাকিবে?—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল আপত্তি যাহারা করিয়াছিল তাহারা কি স্বপ্নেও জানিত যে তাহারা যত বাধাই দিক তাহা স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে!

মার্ডকের সহিত ব্লেগ (Blogg) নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করিতেন। তিনি দেখিলেন, গ্যাসের আলো যদি সাধারণভাবে চালাইতে হয় তবে একসঙ্গে অনেক গ্যাস প্রস্তুত করিয়া খুব বড় যায়গায় তাহা আবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং লোকের বাড়ী বাড়ী যে ভাবে জল সরবরাহ করা হয় সেই ভাবে নলের সাহায্যে গ্যাসও সরবরাহ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে এইরূপ এক একটা কেন্দ্র করিতে হইবে,

নতুবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্যাস তৈয়ার করিবার হাঙ্গামা কেহই পোহাইতে চাহিবে না। তখন তিনি উইনসার নামক আর একজন উদ্যোগী সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের নিকট এইরূপে ব্যবসায় করিবার অনুমতি চাহিয়া এক দরখাস্ত করিলেন। ওঃ চারিদিক হইতে কি ভীষণ আপত্তিই উপস্থিত হইয়াছিল। রাস্তায় রাস্তায় যাহারা তেলের আলো জ্বালিত তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিল, প্রত্যেক পল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্প আঁটিলেন যে তাঁহাদের পাড়ার মধ্যে কোন রাস্তায় যদি গ্যাসের আলো জ্বালিবার চেষ্টা হয় তবে তাহারা আলোর পোস্ট উপড়াইয়া পাইপ তুলিয়া ফেলিবেন। তাহাদের ধারণা ছিল যে পাইপের ভিতর দিয়া গ্যাস আসে উহার মধ্যে সর্ব্বদাই আগুন জ্বলিতে থাকে! তাহাদিগকে যত বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইত যে তাহা নহে, পাইপের ভিতর দিয়া গ্যাসই আসে তাহাতে আগুন মোটে থাকে না, থাকিতে পারে না, ততই তাহারা একেবারে বাঁকিয়া বসিত—কোন মতে বুঝিতে চাহিত না। অন্য পরে কা কথা, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের মিলনসভা সেই যে রয়েল সোসাইটী, তাঁহারাও ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন এত অধিক পরিমাণ গ্যাস এক জায়গায় আবদ্ধ করিবার এই যে চেষ্টা ইহা উন্মত্ততা।

চারিদিক হইতে আপত্তির ঝড় যতই বাড়িয়া উঠিতেছিল, রেগ যেন ততই মজা দেখিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ততই দৃঢ় হইতেছিল। পরিশেষে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে যখন পার্লিয়ামেণ্ট তাহাদিগকে প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করিলেন তখন এই সব ঝড় থামিয়া গেল। তাঁহারা মহা সমারোহে নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই কোম্পানী আজও আছে—ইহা বিলাতের একটী প্রবীণ কারবার। তখন এই কোম্পানীর নাম ছিল—The London and Westminster Chartered Gas Light and Coke Company—এখন সেই নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া হইয়াছে—The Gas Light and Coke Company of London

কাজ যখন আরম্ভ হইল তখন তাঁহাদের তো চক্ষু স্থির—একাজ যে এত বৃহৎ ইহা পূর্ব্বে তাঁহাদের ধারণা ছিল না। যাহা হউক কাজে হাত দিয়া দমিবার লোক তাঁহারা ছিলেন না। কাজ আরম্ভ হইয়াছে—সে কাজ শেষ করিতেই হইবে। কত অসুবিধা কত বিপদ অতিক্রম করিয়া শুধু দৃঢ় সঙ্কল্পের বলে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তখনকার দিনে ধাতু নির্ম্মিত নল যাহাকে তোমরা পাইপ বল তাহা ছিল না। ভাবিয়া দেখ দেখি পাইপ ভিন্ন গ্যাসের আলো কি সম্ভব? সেকালে কাঠের নলের ভিতর দিয়া জল সরবরাহ হইত। তাঁহারা দেখিলেন তাহা দ্বারা গ্যাসের কাজ চলিতে পারে না। তখন তাহারা মাটীর নীচে গ্যাসের প্রধান পথ (মেন) গুলি পাথর দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন। সেগুলি মোটা মোটা হইল—তাহাতে কাজের কোন অসুবিধা হইল না; কিন্তু লোকের বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহ করিবার জন্য যে ছোট পাইপ দরকার তাহা তো মোটা হইলে চলিবে না। তাহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথা ঘামাইয়া এই কার্য্যের জন্য বন্দুকের নল জুড়িয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সকল পাইপ অনেক সময় ফাটিয়া গিয়া অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত

হইত। যতবার এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত ততবারই তাঁহারা তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া নূতন শিক্ষা লাভ করিতেন এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগাইতেন। ঠেকিয়া শিখা ভিন্ন তাঁহাদের শিখিবার অন্য উপায় ছিল না।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ "ওয়েষ্টমিনষ্টার ব্রিজ" নামক স্থানে প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলিল। লোকে দেখিল তাইতো! তাহাদের আপত্তি তাহা হইলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! তাহারা একেবারে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই নিজ নিজ গৃহে ও কারখানায় গ্যাসের আলো পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও কোম্পানীকে ভয়ানক তাড়া দিতে লাগিল। তখনকার দিনে মিটার ছিল না কাজেই কে কতটা গ্যাস খরচ করিল প্রথম প্রথম জানিবার উপায় ছিল না। পরে ক্লেগ একপ্রকার মিটারও নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই বিলাতের সর্ব্বত্র গ্যাসের আলোর প্রচলন হইল। বিলাতের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের লোকও গ্যাসের আলো জ্বালিতে আরম্ভ করিল।

তোমারা ভাবিতেছ গ্যাসের কথা এইখানেই শেষ হইল—তাহা নহে। আরও এত কথা আছে যে সব বলিতে গেলে মোটা একখান বই হইয়া দাঁড়ায়। আমরা মোটামুটি কয়েকটী কথা বলিব মাত্র।

প্রথমেই দেখা গেল কয়লা চোঁয়াইয়া গ্যাস প্রস্তুত করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তবে অকর্ম্মণ্য ছাই ভস্ম নহে—উহা কয়লারই ন্যায় জ্বলে এবং উত্তাপ দিতে পারে, উপরন্তু উহাতে ধোঁয়া হয় না। লোকে তখন কাঁচা কয়লার পরিবর্ত্তে গ্যাস কয়লা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কয়লা চোঁয়াইয়া গ্যাস তৈরি করিবার সময় এক প্রকার ঘন কাল পদার্থ নির্গত হয় তাহা তোমরা জান। আমরা ইহাকে আলকতরা বলি। এই আলকাতরা যে আমাদের কত কাজে লাগে তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে। এই আলকাতরা দিয়া কাঠ রং করিয়া ব্যবহার করিলে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক আঠার বৎসর বয়স্ক বালক রসায়নবিদ্ এই আলকাতরা হইতে একপ্রকার রং প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি পরে ডাক্তার ডব্লু, এচ পার্কিন, এফ, আর এস, নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই রংএর ব্যবসায় যে একটা কতবড় জিনিস তাহা প্রথমটা লোকে বুঝিতে পারে নাই কিন্তু একটা বৎসর যাইতে না যাইতে লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল যে উনিশ বৎসর বয়স্ক পার্কিন একটা কারখানার মালিক হইয়া এক নূতন ব্যবসায়ের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে!

তখনকার দিনে কয়েক প্রকার রং মাত্র পাওয়া যাইত—তাহাও নানাবিধ স্বাভাবিক উপায়ে। লাল নীল প্রভৃতি কয়েক প্রকার রং গাছ হইতে সংগ্রহ করা হইত। নানাদেশে এই সব গাছের আবাদ হইত। আমাদের দেশে নীলের চাষ ছিল। একপ্রকার লাল রং পাওয়া যাইত তাহা তৈয়ার হইত একরকম মাছের রক্ত হইতে। এই সব স্বাভাবিক রংয়ের দাম খুব বেশী ছিল, আলকাতরা হইতে যে রং প্রস্তুত হইল তাহাতে কাজ তেমনি হইত কিন্তু দাম ছিল অনেক কম। কাজেই ইহার সহিত প্রতিযোগতায় স্বাভাবিক রং দাঁড়াইতে পারিল না। পূর্ব্বে বিলাতের অল্প সংখ্যক লোক মাত্র রংএর ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। ক্রমে লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইল এবং প্রতি বৎসর বহু টাকা লাভ করিতে

লাগিল। সস্তা দামের নানাপ্রকার রঙ্গীন কাপড় দেখা দিল। ইংরাজদের দেখাদেখি জার্ম্মাণগণও আলকাতরা হইতে কয়েক প্রকার রং প্রস্তুত করিতে লাগিল।

পার্কিনের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে রংএর ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দা পড়িয়া যায়—কারণ তিনি কাহাকেও রং প্রস্তুত প্রণালী শিখাইয়া যান নাই, তাহার মৃত্যুর পরে এমন লোক ছিল না যে তাঁহার স্থান অধিকারে সমর্থ হয়। বিলাতের জনসাধারণও একার্য্যে তেমন উৎসাহ দেখায় নাই। সেই সুযোগে জার্ম্মাণরা পৃথিবীর রংএর ব্যবসায় প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল।

আলকাতরা হইতে রং প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ঔষধও প্রস্তুত হয়। আলকাতরা হইতে একপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনির সাধারণ নাম স্যাকারিণ (Saccharine) —ইহা সাধারণ আঁখের চিনি অপেক্ষা তিন শতগুণ মিষ্টি। ইহা ছাড়া আলকাতরা হইতে ওয়াটারপ্রুফ তৈয়ারী করিবার ন্যাপ্‌থা, মোটরের একপ্রকার তেল, নানাপ্রকার বিস্ফোরক পদার্থ, নানাবিধ এসিড, রাস্তা-টার, গন্ধদ্রব্য, স্মেলিং সল্ট, জমির সার এমোনিয়া, যুদ্ধকালে ব্যবহৃত বিষ-বাষ্প প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত হয়।

প্রথম প্রথম কয়লার গ্যাসই আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, পরে আমেরিকানরা ইহার সঙ্গে আর একপ্রকার গ্যাস মিলাইয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এই দ্বিতীয় গ্যাসকে জলীয় গ্যাস বলা হয়। ইহার সহিত মিশানর ফলে আসল কয়লার গ্যাস খরচ অনেক কম হয়। আজকাল আমরা যে গ্যাস জ্বালি তাহাতে এই দুই রকম গ্যাস মিশান থাকে।

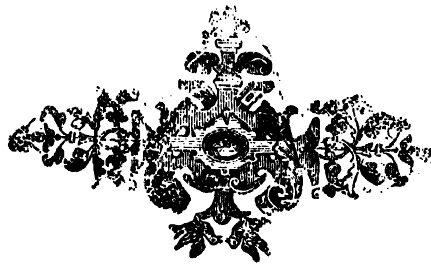
তোমরা হয়ত জান আগেকার কালে চিমনীর আলো ছিল না। তখন লোকে তিমি প্রভৃতি জন্তুর চর্ব্বি দিয়া মোমবাতির ন্যায় একপ্রকার বাতি প্রস্তুত করিয়া জ্বালাইত। কেরসিন প্রভৃতি খনিজ তেল তখনও আবিস্কৃত হয় নাই। কিছুদিন পরে যখন চিমনীর আলো বাহির হইল—(আর্গাণ্ড নামে বিলাত-প্রবাসী একজন সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় চিকিৎসক প্রথম চিমনীর আলো নির্ম্মাণ করেন), তার অল্প দিন পরেই আবার যখন ইলেক্‌ট্রিক আলো দেখা দিল তখন গ্যাসের আদর কমিয়া গেল। গ্যাসওয়ালারা দেখিল যদি এমন কোন উপায় আবিষ্কার না করা যায় যাহাতে গ্যাসের দ্বারা চিমনীর অথবা ইলেক্‌ট্রিকের আলোর ন্যায় অথবা আরও জোড় আলো হইতে পারে তবে এ ব্যবসায় আর চলিবে না। তখন নানাদেশের গ্যাস ব্যবসায়ীগণ এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছুই হইয়া উঠিল না। অনেক চেষ্টার পর ম্যাণ্টেলের আবিষ্কার হইল।

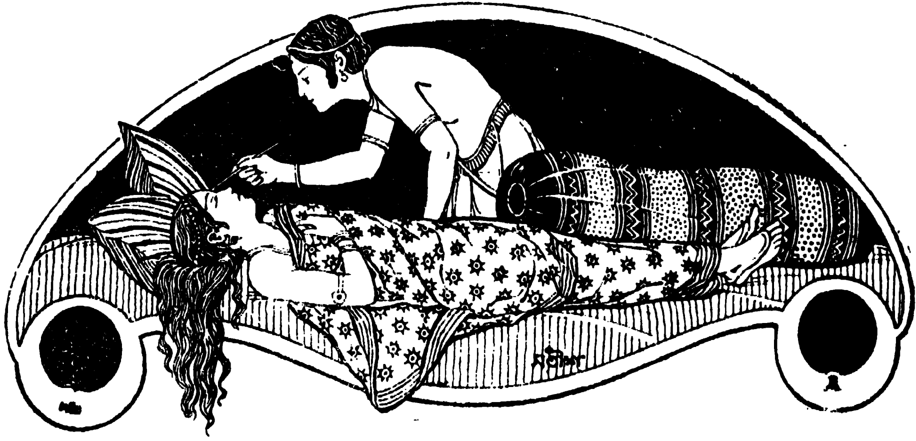
তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যাঁহারা গ্যাস জ্বালাইবার নূতন উপায় উদ্ভাবণের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে, কেহ ম্যাণ্টেলের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই—অন্য একজন লোক দৈবাৎ ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই লোকটীর নাম ছিল ওয়েলস ব্যাস্। ইনি একজন অষ্ট্রিয়ান। ইনি নিজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বসিয়া একটী নূতন বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নানাবিধ পরীক্ষা করিতে করিতে একটুকরা ন্যাকড়া একটা রাসয়নিক জিনিসে ভিজাইয়া উহা প্রজ্বলিত করিলেন। ন্যাকড়াটুকু যখন জ্বলিয়া শেষ হইয়া গেল তখন, তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে রাসায়নিক

পদার্থটী অবিকৃত রহিয়াছে আর উহার আকার ঠিক ন্যাকড়াটীর মত আছে। তখন তিনি উহাতে আরও উত্তাপ প্রয়োগ করিলেন, তথাপি উহা জ্বলিল না, কিন্তু উহা হইতে এক উজ্বল আলোক নির্গত হইল। তখন তিনি যে পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন এই রাসায়নিক পদার্থ হইতে এমন একটা জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে যাহাতে গ্যাস জ্বালিয়া উত্তপ্ত করিলে উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে ম্যাণ্টেলের উৎপত্তি হইল।

ম্যাণ্টেল জিনিসটী কি ? ইহা জালের তৈয়ারী কতকটা টুপীর আকারের একটী জিনিষ। প্রথমে থোরিয়া ও সিরিয়া (৯৯ ভাগ থোরিয়া এক ভাগ সিরিয়া) নামক দুইটী রাসায়নিক জিনিষের মিকশ্চার তৈয়ার করিয়া এই টুপীর আকারের জিনিষটী তাহার ভিতর চুবাইয়া লওয়া হয়। তারপর ইহাকে গ্যাসের জ্বলিবার মুখে পরাইয়া দেওয়া হয়। তারপর দিয়াশেলাই ধরাইয়া দিয়া গ্যাস ছাড়িয়া দিলে আসল জালটী পুড়িয়া যায়—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মিকশ্চারটী যাহা টুপীর গায়ে লাগিয়াছিল তাহা টুপীর আকারে রহিয়া যায় এবং গ্যাসের উত্তাপে উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। সুতরাং আজকাল যে গ্যাসের আলো জ্বালা হয় উহা, ঠিক গ্যাসের আলো নহে—ম্যাণ্টেলের আলো। গ্যাস শুধু উত্তাপ দিয়া ম্যাণ্টেলটীকে গরম করিয়া দেয় মাত্র।

আগে গ্যাস শুধু আলো জ্বালিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত, আজ কাল গ্যাস কত কাজেই না লাগিতেছে। শীতপ্রধান দেশের লোক গ্যাস জ্বালিয়া ঘর গরম করে। গ্যাসের নানাবিধ উনান বাহির হইয়াছে—তাহাতে রান্না হয়। সাইকেল, ট্রাঙ্ক হাতবাক্স প্রভৃতির রং মজবুত স্থায়ী করিবার জন্য গ্যাসের আগুন ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ বিস্ফোরক যন্ত্রেও গ্যাস ব্যবহৃত হয়। গ্যাস এবং আলকাতরা যে মানুষের কত কাজে লাগিতেছে—তাহার ইয়ত্তা করিবে কে ?





যুগমাহাত্ম্য

(রূপকথা)

[শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ,]

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। দিন আনে, দিন খায়। ব্রাহ্মণটী ছিলেন নেহাৎ ভালমানুষ; এ গ্রামে সে গ্রামে দু'চারিটা নিমন্ত্রণ, আর পূজাটা, ব্রতটা করিয়া যা' কিছু ভগবান মিলাইতেন তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে দিনগুলি কাটিয়া যাইত। দুঃখের বিষয় ঘরের গিন্নী ছিলেন ভারি কুঁদুলে; এটা সেটা করিয়া বেচারা ব্রাহ্মণকে একতিল সোয়াস্তি দেন না।

সে দিন নাকি রাজবাটীতে মহাধূম—রাজ্যময় দানের ঘটা। রাজা কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন; দীনদুঃখী, ব্রাহ্মণ-কাঙ্গাল যার যত ইচ্ছা দান লইয়া মহারাজকে দু'হাতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কথা ব্রাহ্মণীর কাণে পৌঁছিল। যাহাতক শোনা আর কথা নাই—"ওগো জপ-তপ ফেলে একটু রাজবাড়ীতে যাওনা। দু'দিন যাবৎ নাকি মহারাজ কল্পতরু হয়েছেন—টাকাকড়ি, মণিমাণিক্য নাকি চাইবামাত্র দান করছেন। পোড়াকপালে এমনই ছিল যে খাবার থাক্‌তেও আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরতে হ'ল।" সাত পাঁচ বলিয়া ব্রাহ্মণকে অস্থির করিয়া তুলিল। অগত্যা গিন্নীর কথায় সায় দিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"যাব যাব, কালই গিয়ে দান আনব।"

পরদিন ভোর না হ'তেই ব্রাহ্মণী বক্তৃতা সুরু করিলেন। ব্রাহ্মণ আর কি করেন, রাজবাড়ীর দিকে বাহির হইলেন। রাস্তা বহুদূর—বন-জঙ্গল, মাঠ, পার হইয়া আসিতে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ঠিক, গোধূলির সময় ব্রাহ্মণ সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজবাড়ী প্রবেশ করিবেন এমন সময়

প্রহরী জোর-গলায় বলিল—"ঘণ্টা অ্যাবি বাজ গিয়া, দান বন্ধ হো গিয়া।" ব্রাহ্মণ অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া প্রহরীর হাত ধরিয়া একবার রাজদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। রাজা প্রহরীর নিকট সব শুনিয়া ব্রাহ্মণকে আনিতে বলিলেন। সে সময় তিনি এক জহুরীর সহিত হিসাব-নিকাশ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের নিকট তাহার অভাব দৈন্যের কথা শুনিয়া মহারাজের মন গলিয়া গেল এবং তখনই তাহাকে একটী মাণিক্য দান করিলেন। ব্রাহ্মণ মহারাজকে দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ী চলিলেন।

হীরা-মাণিক্য দর্শন ত জীবনে এই প্রথম, কাজেই এর কদর ব্রাহ্মণ আর কি বুঝিবেন? সামান্য দান মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন। জহুরীর মনটা কিন্তু এতক্ষণ আন্‌চান্‌ করিতেছিল, লোলুপ দৃষ্টিতে মাণিক্যটী দেখিয়া দেখিয়া শেষটায় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল—"মহারাজের শরীরটা একটু অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। অনুমতি হ'লে আমি কাল এসে মহারাজের অবকাশ মত হিসেব পরিষ্কার কর্‌তে পারি।"

"তাই ভাল" বলিয়া মহারাজ অন্দরে চলিয়া গেলেন।

জহুরী উর্দ্ধশ্বাসে ব্রাহ্মণের পিছু পিছু ছুটীয়া আসিয়া হাজির; "ঠাকুর, একটা কথা—মহারাজ আপনাকে ওটা কি দিলেন, কাচের মত কি বলে মনে হ'ল।"—বলিয়া আলাপ জুড়িয়া দিল। ব্রাহ্মণ সরল মনে বলিলেন "দেখ না, এই যে।" জহুরী মাণিক্যটী হাতে নিয়া বলিল, "ঠাকুর, এ সব জিনিষ দিয়ে আমরা অলঙ্কার ঘসা-মাজা করে থাকি। তা' আপনি আমার কাছে এটা বিক্রী করে ফেলুন। এই নিন্, এর দাম চার আনা।" জহুরীর আকার-ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল; তিনি তার কথায় রাজী হইলেন না। ব্রাহ্মণ একটু চোখ ফিরাইতেই জহুরীভায়া একেবারে চম্পট্। ব্রাহ্মণ আর কি করেন; মাথায় হাত দিয়া দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী সব কাণ্ড কীর্ত্তন শুনিয়া রাগে ফুলিয়া গর্ গর্ করিতে লাগিল; রক্তজবার মত রাঙা চোখ দুইটী কপালে তুলিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই মহারাজ বহুমূল্য জিনিষ দিয়েছিলেন—হয়ত বা মাণিক্য হ'বে। বোকা-মিন্‌ষে হাতে পেয়েও আন্‌তে পারলে না।" সারারাত্রি এ সব বলিয়া গৃহিণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল—আহার নিদ্রা ত্যাগ এই সব ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রমাদ গণিলেন; কি আর করিবেন, 'মা দুর্গা' বলিয়া পরদিন ভোরে ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন।

(২)

মহারাজ দরবারে বসিয়াছেন—পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ সব উপস্থিত। এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির। ঠিক সে সময়ে ঈশ্বরেচ্ছায় জহুরীও আসিয়া তাহার খাতা-পত্র নিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে রাজসভায় দেখিবামাত্র তার যেন ভয়েতে কম্পদিয়া জ্বর আসিল। জহুরীর নামে ব্রাহ্মণের অভিযোগ শুনিয়া রাজা বলিলেন—"আপনার সাক্ষী?"

—"সাক্ষী আমার ভগবান, আর যদি মানুষ হয় তবে জহুরী নিজেই" জহুরী যেন হঠাৎ আকাশ

হইতে পড়িল ; চোখ-মুখ শুকাইয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—"মাণিক্য ! দোহাই মহারাজ, আমার নামে মিথ্যা নালিশ ; মাণিক্যের বিষয় আমি কিছুই জানিনে ! ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী।" মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—"আপনার কে আছে ?"—"একটী শিশু-পুত্র আর ব্রাহ্মণী।"

মহারাজ দৌবারিক ডাকিয়া ব্রাহ্মণ-বালককে রাজসভায় আনাইলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"আপনার অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে আপনার একমাত্র পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে শপথ করুন যে জহুরী আপনার মাণিক্য চুরি করেছে" ব্রাহ্মণ একটু থামিয়া পরে বলিলেন—"পারি বৈ কি ? সত্যকথা পুত্রের মাথায় হাত দিয়েও বল্‌তে পারি।" এই বলিয়া তিনি ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—"জহুরী কাল আমার নিকট হ'তে মহারাজার প্রদত্ত মাণিক্যটী চুরি করেছে—ইহা সত্য।" বলা—আর অমনি ব্রাহ্মণ-কুমার ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া মারা গেল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার—সভাশুদ্ধ লোক একেবারে অবাক্‌। বিধাতার কি ইচ্ছা ব্রাহ্মণ কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। রাজসভায় সকলের ঠাট্টা তামাসা, মহারাজের ভৎ'সনা, শুনিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণের চোখে জল আসিল। তিনি এক হাতে মরা ছেলে কাঁদে ফেলিয়া অপর হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে যেদিকে চক্ষু যায় চলিতে লাগিলেন।

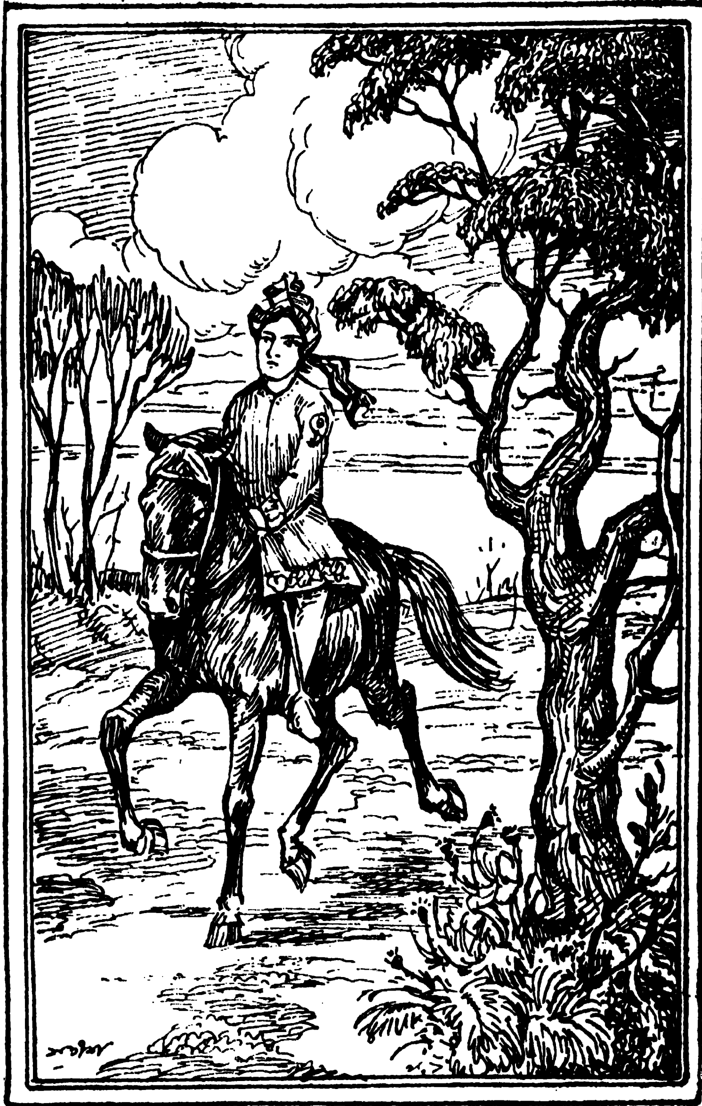
চলিতে চলিতে মাঠ, প্রান্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত, অবসন্ন হইয়া বনের ধারে পথিপার্শ্বে ছেলেকে কোলে নিয়া বসিয়াছেন। পড়ন্ত বেলা—সমস্ত শরীরও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মণ বুকের করুন জমাট ব্যাথা আর চাপা রাখিতে পারিলেন না—গণ্ড বহিয়া তপ্ত অশ্রু দর্‌ দর্‌ করিয়া পড়িতে লাগিল। মাথায় হাত দিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় অশীতি বর্ষের এক থুন্‌থুনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাশে আসিয়া বলিল—"বাবা, পথটা ছেড়ে দাও। আমি এই সরু পথটী ধরে বনের ওধারে যাচ্ছি।" ব্রাহ্মণ পক্ককেশ, গৈরিক বসন বৃদ্ধের পা' ধরিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া বলিল—"বাবা, একি অন্যায় বিচার, সত্য কথায় আমার একমাত্র শিশুপুত্র মারা গেল।" বৃদ্ধ ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলেন—"আমার পাছে আর একটী ব্রাহ্মণ আস্‌ছেন, তিনি তোমার কথার উত্তর দিবেন।"—বলিয়া লাঠিতে ভর দিয়া ঠক্‌ ঠক্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেলন।

একটু পরেই আর একজন বৃদ্ধ আসিয়া ব্রাহ্মণকে সেখানে দেখিলেন। সেই বন পার্শ্বে, সেই নির্জ্জন স্থানে, সেই ক্ষীণ চোখের সজল করুণ দৃষ্টিতে তেম্নিভাবে চাহিয়া আছেন। "আমার পাছে যিনি আসছেন, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন"—বলিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় বৃদ্ধটীর চেহারা রুক্ষ, স্বভাব উগ্র—আসিবামাত্র বলিলেন—"সরে যাও, বল্‌ছি সরে যাও। গোটা রাস্তাটা জুড়ে বসেছ, তোমার সখটা ত সতের আনা দেখছি।" নিরুপায় দেখিয়া ব্রাহ্মণ কত কাকুতি মিনতি করিয়া নিজের দুরদৃষ্টের কথা বলিলেন। বৃদ্ধ কিনা উত্তর করিলেন—"হাঁ, সত্যকথায় পুত্র মারা যাবে, তা এযুগে অসম্ভব নয়। আমার পাছে 'রাজা' আসছেন, তিনিই সব বল্‌বেন, তাঁরই এখন পূর্ণ অধিকার।" বলিয়াই "সরে পড়, সড়ে পড়" বলিয়া রাস্তা আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন।

(৩)

দেখিতে দেখিতে দিব্যকান্তি, উন্মুক্তকৃপাণ একযুবা পুরুষ একটা ধব্ধবে শাদা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া মস্ত বড় একটা গাছের তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য তাঁহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবে কি



উজ্জ্বল দীপ্তি তাঁহার মুখ-মণ্ডলে! কাল কোঁকড়ান চুলগুলিতে কি মধুর জ্যো'স্নার আলো মাখানো রহিয়াছে—শরীর হ'তে অগুরু, কুঙ্কুমের স্নিগ্ধ গন্ধ বাতাসের সাথে কেমন ছুটিয়া চলিয়াছে। গলায় তাঁহার

মুক্তার মালা, আর মাথার উপর মণিমুক্তাখচিত উজ্জ্বল রাজ-মুকুট। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যের ছটা নিরীক্ষণ করিয়া আপনার রূপে আপনি মজিয়া গেলেন। সেই বন আলো করা রূপের ছটা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া স্বপ্ন-রাজ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত রূপ, এত সৌন্দর্য্যের মাঝেও আগন্তুকের মুখে এতটুকু হাসির রেখা নাই; ব্যস্ততা ও বিস্ময়ের কি একটা ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ পলকহীন নেত্রে চাহিয়া আছেন দেখিয়া যুবক তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন। তখন ব্রাহ্মণের চমক্ ভাঙ্গিল; ছেলেকে রাখিয়া ছল্ ছল্ চোখে ছুটিয়া আসিয়া যুবকের পা' ধরিয়া বলিলেন—"দোহাই মহারাজের, আমার একি বিপদ হ'ল বলুন, সত্য কথায় আমার একমাত্র পুত্র মারা গেল।"

আগন্তুক ত সব ব্যাপার জানেন-ই হাসিয়া উত্তর দিলেন "হাঃ, এ যে যুগের-ই মাহাত্ম্য সত্যকথায় পুত্র মারা যাবে না? সত্য-- সত্য--সত্য! দেখলেন সত্য কবে চলে গেল? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—একে একে তোমার নিকট বিদায় হ'য়ে চলে গেল। তাঁদের দিন ফুরিয়ে গেছে, এখন আমার রাজত্ব, পূর্ণ অধিকার; সত্যের দোহাই দিয়ে কাজকর্ম্ম করলে প্রায়ই সুফল ফলে না বরং কু-ফল ফলে। এ বিচার ন্যায় বিচার, এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই।"

ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তবে আমার কি উপায় হ'বে? আমার মৃত-পুত্রের পুনর্জীবন লাভ হবে কি, ঠাকুর?"

"হবে বৈ কি? আমার কথা শোন ত সব হবে।"

"কি, বলুন"

"আর কি?—আমায় ধরে থাক আমায় অবলম্বন কর। যুগধর্ম্ম--মিথ্যা, জুচ্চুরি, অধর্ম্ম—এ সবের বীজ আজ হ'তে স্ব-শরীরে রোপণ কর। আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে সত্যের ক্ষীণালোকটী পর্য্যন্ত অন্তর হ'তে মুছে ফেল; তা' হ'লেই সব হবে, তোমার কোন বাসনাই অ-পূর্ণ থাক্‌বে না।"

"কি বল্‌ছেন, ঠাকুর?" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন। "সোজা কথা—আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। দেখছনা আজকাল দেশে কি হাওয়া বইছে গোটা দেশটা চালাকের হাতে। মামলা বল, চাকুরী বল, ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল- খাঁটি কথা বল্‌লে হার্‌তে হয়। তাই, আইনজ্ঞদের নিকট পরামর্শ নিয়ে, অসত্য বর্ম্মে সজ্জিত হ'য়ে বিচারকের নিকট সত্য গোপন করতে হয়; তা' হলেই মামলা জয়—তা' হলেই সব আশা পূর্ণ হয়, সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারে বাস্তব্য করা চলে। যতদিন কলি রাজত্ব থাক্‌বে ততদিন সকলকে না হ'লেও অনেক মানুষকে-ই এ ভাবে 'অ মানুষ' হ'য়ে চল্‌তে হবে; এর পরিণাম ভীষণ সন্দেহ নাই, তবুও আপাত মধুর বলে লোক এই অধর্ম্ম, অসত্যকে-ই আক্‌ড়ে ধরে থাকে।"

ব্রাহ্মণ হাঁ করিয়া পলকহীন নেত্রে কলিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়া অসত্যের—পাপের পূর্ণ অধিকার তাঁহার মধ্যে বিস্তার হইল। ব্রাহ্মণ আর সে ব্রাহ্মণ নাই, বলিলেন—"ঠাকুর, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, আপনি যা' বল্‌বেন আমি তা' কর্‌ব।

"তবে এস আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"কি করব, বলুন।"

"আগে রাজবাড়ী গিয়ে মহারাজের নিকট হাজির হও।"

"তিনি আমার মুখ-দর্শনও করবেন না, ঠাকুর।"

"সব হবে—কোন ভয় নেই। তুমি গিয়ে বল যে—মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন; সেবার আমি জহুরীর নামে মিথ্যা নালিশ করেছিলাম, তার শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে। এখন আমি আপনার নিকট প্রকৃত ঘটনা বলতে এসেছি।"—দেখবে তিনি তোমায় স্থান দিবেন।

"তারপর?"

তারপর বলবে যে—"মহারাজ এবার আমি সত্য কথা পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে বলছি, দেখবেন গুরুর কৃপায় আমার মৃত পুত্রের দেহে জীবন সঞ্চার হবে।" তখন তুমি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলবে "জহুরী আমার নিকট হ'তে 'দুইটী' মাণিক্য চুরি করেছিল। আমি দিতে অস্বীকার করায় সে আমাকে এম্নি নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করলে যে আমার প্রাণ যায়-যায়।"—দেখবে আমার কথামত কাজ করলে মহারাজ তোমার কথা শুনবেন এবং তোমার মরা ছেলে বেঁচে উঠবে।

"তাই করব", বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজী হইলেন।

তখন কলিরাজ সে রাত্রির মত বিদায় হইলেন।

(৪)

তখনও সূর্য্যদেবের রথের চূড়ার লাল নিশান পূব আকাশে দেখা দেয় নাই—সবেমাত্র দোয়েল কোয়েলের কাকলি ফুরফুরে হাওয়ায় ভাসিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণের চোখে ত ঘুম নাই—বসিয়া কেবলই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কলিরাজ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে ও ব্রাহ্মণ বালককে সঙ্গে করিয়া সত্বর ফটকের সামনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ততক্ষণে রাজ বাড়ীর নহবতে পোঁ সুর বাজিয়া উঠিয়াছে—লোকজন নিজ নিজ কাজকর্ম্মে ব্যস্ত। কলিরাজ দেখিলেন আর বিলম্ব করা চলে না। তিনি অমনি ব্রাহ্মণকে কথামত কাজ করতে আদেশ দিয়া আকাশে মিশিয়া গেলেন। যাবার সময় আবার বলিলেন—"আমি দেখ্ব তুমি কেমন হুকুম তামিল কর।"

ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া গুরুদেব কলিরাজের উপদেশ মত সব করিলে মহারাজ তাহাকে বসিবার আসন দিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"তা' বেশ, আপনি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে প্রকৃত কথা এখন বলুন। ব্রাহ্মণ সেই রাজসভায় সকলের সামনে মৃত পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—"দোহাই মহারাজ, জহুরীর নামে আমার পূর্ব্ব নালিশ মিথ্যা। সে বাস্তবিক আমার নিকট হ'তে 'দুইটী' মাণিক্য চুরি করেছিল ও আমাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করতে করতে আধ-মরা করেছিল।" বলা—আর অমনি সেই শিশু-পুত্র সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চোখ মুছিয়া ডাকিয়া উঠিল—'বাবা'। ব্রাহ্মণ অসীম আগ্রহে ছেলেকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিলেন ও কলিরাজের শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। সভাশুদ্ধ

সে... একেবারে অবাক।—এ যে কল্পনারও অতীত। ব্রাহ্মণের অমানুষিক কার্য্যকলাপে সকলে বিস্মিত হইল এবং একবাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল।

রাজা ভাবিলেন—"তাই তো। ব্রাহ্মণকে আর একটী মাণিক্যই বা কে দিলে। তা সত্য না বল্‌লে কি আর মরা ছেলে বেঁচে উঠছে।" রাজা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। জহুরীকে সেস্থানে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দৌবারিক পাঠাইলেন। একটু পরেই সেই রাজসভায় জহুরী আসিয়া উপস্থিত। হঠাৎ আবার রাজসভায় ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জহুরীর মাথায় বাজ পড়িল। মহারাজ তাহাকে চোখ রাঙাইয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভয়ে তাহার বুক শুকাইয়া গেল, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার, ব্রাহ্মণের পূর্ব্বের অভিযোগই সত্য। আমি তাঁহার নিকট হ'তে একটীমাত্র মাণিক্য নিয়েছিলুম, কিন্তু তাহাকে কোনপ্রকার প্রহার করি নি।" এখন সত্য বলিলেও কে শোনে? সকলে তাহাকে চোর, মিথ্যাবাদী বলিয়া অপমান করিতে লাগিল। এদিকে হারাণো মাণিক কোলে পাইয়া ব্রাহ্মণের প্রাণে অপার আনন্দ—মুখে অফুরন্ত হাসি—ফুটিয়া উঠিল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে বিস্তর টাকাকড়ি, ধন-সম্পদ দিলেন; তিনি মহারাজকে দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। আর জহুরীর পুরস্কার হইল—শ্রীঘর।

এ গূঢ়রহস্যটা কিন্তু ব্রাহ্মণ কলিরাজের ভয়ে কাহারও নিকট খুলিয়া বলিলেন না—পাছে বা আবার ছেলের জীবন যায়, কি কোন রকম অনিষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলে ব্রাহ্মণী ত সব শুনিয়া অবাক। মণি-রত্ন দেখিয়া তাহার সুখের সীমা রহিল না। হাসি আর আনন্দের একটা সোর গোল পড়িয়া গেল—ব্রাহ্মণী প্রাণঢালা ভালবাসা, মনভরা সোহাগটুকু নিয়া ব্রাহ্মণকে আদর যত্ন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের কুঁড়ে ভাঙ্গিয়া সুরম্য অট্টালিকা তৈরী হইল; চঞ্চলা কমলা অচলা হ'য়ে তাহাদের ঘর আলো করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ বেচারীর কিন্তু এত টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত নাড়াচাড়া করিতে করিতে মন বিগড়াইয়া গেল; জপ-তপ, পূজার্চ্চনা ভুলিয়া বিলাসভোগে ডুবিয়া তিনি গুরুর কৃপায় দিন দিন পতনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন যুগধর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া ব্রাহ্মন শেষটায় খাটি কলির ব্রাহ্মন সাজিলেন—যুগ-মাহাত্মের ফল সর্ব্বত্রই ফলিল।

বাণী পূজায়

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ]

মাঘের শীতে হিঃ হিঃ করে' কাঁপ্‌বে সারা দেহ!
তবু মোরা উঠ্‌ব ভোরে ভক্তিভরে স্নানটা করে'
হাতে লয়ে ফুলের সাজি ছুট্‌ব উপবনে,
ভাল ভাল কুসুম কত তুল্‌ব সযতনে।

"নিজের হাতে গাঁথ্‌ব মালা আমরা ছেলের দলে!
ফলমূল মিষ্টান্ন কত আন্‌বে মোদের সাধ্যমত—
বাণীর রাঙা চরণ মূলে করব নিবেদন,
বল্‌ব মাগো, দোষ ধরনা, আমরা অভাজন!"

"দয়া করে' দাও মা খুলে মোদের অন্ধ আঁখি,
শিখাও মোদের মানুষ হ'তে মানুষ হয়ে এ জগতে,
পশুর মত যেন মোদের হয়না মতি গতি—
দাও মা সত্য জ্ঞানের আলো—লও মা স্তুতি নতি।"

নূতন ধাঁধাঁ।

১। ত্রিবর্ণেতে নাম এক পুরুষ রতন।
শুনিলে আশ্চর্য্য হবে জগতের জন॥
এক মাস নর আর অন্য মাস নারী।
রাজত্ব করিয়াছিল পৃথিবী উপরি॥
বল দেখি কোন জন হেন রূপ ধরি।
গিয়াছে কানন মধ্যে ভক্ষ্য গ্রহণ করি॥

—শ্রীলালমোহন রায়।

"দোহাই মহারাজ, জ[illegible] বাহন।
মাণিক্য চুরি করেছিল ও আ[illegible] ভূষণ॥
অমনি সেই শিশু-পুত্র সুপ্তোত্থিতে[illegible]
ছেলেকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিলেন ও কাঁদি[illegible]

কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান দ্বিভুজা মুরতি।
বল দেখি কোন জন এহেন আকৃতি॥

—শ্রীলালমোহন রায়।

৩। তিনাক্ষরে নাম তার শোভে দেব মাথে।
দ্বিতীয় তৃতীয় মিলে শোভিত পদেতে॥
উপকার হয় ভাই প্রথম তৃতীয়ে।
মনস্তুষ্টি না হইবে প্রথম দ্বিতীয়ে॥

—শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

